ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ।। ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১৮ মে, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

লুধিয়ানায় এন ডি এ-র ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রদর্শনী। এক মঞ্চে এন ডি এ-র নেতৃবৃন্দ।

দিল্লীর মসনদ কার দখলে?

এখন পরীক্ষা প্রতিভা পাতিলের

গূঢ়পুরুষ ।। সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়েছে। এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে তখন ফলাফলও সকলেরই জানা। শুরু হয়েছে কেন্দ্রে সরকার গড়া নিয়ে টানাপোড়েন। রাজনৈতিক দল ও জোটের তৎপরতা। এই পরিস্থিতিতে এবার রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও তাঁর সংবিধানের প্রতি আনুগত্য কতটা তারও পরীক্ষা হবে। ভোটের ফলাফল আগাম বলাটা বুদ্ধির পরিচয় নয়। তবু একটা কথা অনুমান করা গেছে পাঁচ দফা ভোটের শেষে যে কোনও একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল এবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ম্যাজিক সংখ্যা ২৭২ টপকাতে বিজেপি বা কংগ্রেস কেউই একক দল হিসাবে সম্ভবত পারবে না।

গোল বেঁধেছে ঠিক এখানেই। এইরকম পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি কী করবেন। বি জে পি-র মুখপাত্র প্রখ্যাত আইনজীবী অরুণ জেটলি বলেছেন, রাষ্ট্রপতি একক বৃহত্তম দলের নেতাকে সরকার গড়তে প্রথমে ডাকবেন। ভারতের সংবিধান এমনই নির্দেশ রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এমন নির্দেশ দেশের সংবিধান দেয়নি বলে বিজেপি-র দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছে। কংগ্রেসের বক্তব্য, একক বৃহত্তম দল নয় রাষ্ট্রপতি সরকার গড়তে ডাকবেন বৃহত্তম জোটকে। কারণ, সিঙ্গল মেজরিটি পার্টি হলেই সেই দল সরকার গড়তে পারবে এমন নিশ্চয়তা না থাকলে রাষ্ট্রপতি আমন্ত্রণ জানাবেন না। বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিলিত জোটের যদি কেন্দ্রে সরকার গড়তে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তবে সেই

প্রতিভা পাতিল

জোটের প্রধান নেতাকে রাষ্ট্রপতি সর্বপ্রথম আহ্বান জানাবেন।

এখানেও বিতর্ক আছে। ধরা যাক, কংগ্রেস লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে দাবি করলো যে তার নেতৃত্বে গঠিত ইউ পি এ জোটে এতগুলি রাজনৈতিক দল যুক্ত আছে এবং জোটের মোট সাংসদ ২৭২ বা তারও বেশি। সুতরাং কেন্দ্রে সরকার গড়তে এই জোটকেই রাষ্ট্রপতি ডাকুন। অন্যদিকে বিজেপিও এন ডি এ জোটের তালিকা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাল্টা দাবি জানিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এমনক্ষেত্রে উভয় তালিকায় জোট শরিক দল হিসাবে বেশ কয়েকটি কমন নাম থাকবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে নিজস্ব সূত্রে প্রথমে যাচাই করতে হবে। অথবা উভয় জোটের সমস্ত সাংসদদের একত্রে রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেকে যাচাই করতে হবে। সাংসদদের লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে জানাতে হবে তাঁরা জোটের শরিক।

জানালেই হবে না। জোট শরিক দলের সাংসদদের বা দলীয় নেতৃত্বকে প্রমাণ দিতে হবে যে তাঁরা এই জোট গড়েছেন নির্বাচনের আগেই। এবং জোট প্রার্থী হিসাবেই তাঁরা নির্বাচনে লড়েছেন। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরেই ক্ষমতা দখলের জন্য জোট গড়া হলে তা গ্রাহ্য হবে না। এখানেই কংগ্রেসের ইউ পি এ বেশ কিছুটা বেকায়দায় পড়েছে। কারণ এই জোটের তিন চারটি শরিকদল জোট ছেড়ে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। জোট শরিক হিসাবে নয়। তবে কী লালু-মুলায়ম-পাশোয়ানরা ইউ পি এ জোটে ফিরতে পারবেন না? পারবেন। তবে তাঁর আগে তাঁদের লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে জানাতে হবে এবং দলের নির্বাচিত সাংসদদের উপস্থিত করিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে তাঁরা কংগ্রেস নেতৃত্বে ইউ পি এ জোটকে সমর্থন করছেন। সেই সমর্থন জোটে পুনরায় যোগ দিয়ে ভিতর থেকেও হতে পারে অথবা বাইরে থেকে। যেভাবে বামপন্থী সাংসদরা একদা বাইরে থেকে সমর্থন করে সংখ্যালঘু ইউ পি এ জোট সরকারকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

হ্যাঁ, রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের পরীক্ষাটা ঠিক এখানেই। এক সময়ে মহারাষ্ট্রে তিনি কংগ্রেস মন্ত্রী ছিলেন। পরে দলই তাঁকে রাষ্ট্রপতি করেছে। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বশংবদ প্রতিভা

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!

SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।

যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।

যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –

Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221

SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

মাওবাদী প্রচণ্ডর ভারত বিরোধিতা
সি পি এম একেবারে চুপ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পুষ্প কুমার দহল বা প্রচণ্ডের নেতৃত্বে নেপাল সরকারের ভারত বিরোধী ভূমিকা নিয়ে সি পি এম চুপ কেন? অথচ নেপালে মাওবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার সময় সিপিএম গলা ফাটিয়ে তাদের সমর্থন করেছিল। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি কাটমাণ্ডু গিয়ে প্রচণ্ডের সঙ্গে দেখা করে আসেন। কিন্তু ক্ষমতায় বসার পর প্রচণ্ড প্রথম বিদেশ সফরে যান চীনে। অথচ ২০০ বছরের নেপালের রীতি ছিল নতুন রাষ্ট্রপ্রধান নয়াদিল্লী দিয়েই তাঁর বিদেশ সফর শুরু করবেন। মাওবাদী প্রচণ্ড সেই রীতি ভেঙে চীনের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে লাগলেন। সেইসঙ্গে দীর্ঘদিনের ভারত নেপাল চুক্তি বাতিল করার দাবি তুললেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং বিজেপি বরাবরই মাওবাদীদের হাতে নেপালের

প্রচণ্ড

ক্ষমতা চলে যাওয়ার বিরোধিতা করেছে। এর পিছনে যে চীনের অঙ্গুলিহেলন থাকতে পারে তা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। সেই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না তা এখন প্রমাণ হচ্ছে। প্রচণ্ডের তীব্র ভারত বিরোধী মনোভাব থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে যে নেপালের

(এরপর ৪ পাতায়)

পুলিশ নির্বিকার

মালদার গ্রামে হিন্দুদের ওপর হামলা

সংবাদদাতা ঃ মালদা ।। মালদা জেলার বৈষ্ণব নগর থানার কৃষ্ণপুর গ্রামের পর এবার গাজোল থানার আলাল অঞ্চলের অন্তর্গত মুড়িয়াকুণ্ড, শ্রীকৃষ্ণপুর, ইটবাধা, ইন্দ্রসাইল, জোড়গাছী, সুলতানপুর, রাণীপুর, আলাল পাবনাপাড়া, বেড় রসিকপুর ইত্যাদি গ্রামগুলিতে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাণ্ডব চালাল মুসলিম দুষ্কৃতীরা। তাদের সশস্ত্র আক্রমণে হাসুয়ার আঘাতে শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের দিলীপ বিশ্বাসকে(৫৫) গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে মালদা সদর হাসপাতালে এবং পরে সেখান থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত ৬ মে রাতে। একটি বরযাত্রী দল কাঁচা রাস্তা ধরে যখন মুড়িয়াকুণ্ডু গ্রামের মসজিদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন মুসলিমরা বাজনা বাজাতে নিষেধ করে এবং তারপর মসজিদ থেকে বের হয়ে তারা বরযাত্রী ও বাজনা বাদকদের ওপর সশস্ত্রভাবে চড়াও হয়। মুসলিমরা বাদ্যযন্ত্র ভেঙে দেয়, বরযাত্রীদের মারধোর করে এবং মহিলাদের টানাটানি করে। এতে হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। গ্রামটি মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় হিন্দুরা তেমন কিছু করতে পারেনি।

এই ঘটনার প্রতিবাদে পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণপুর গ্রামের হিন্দুরা ৪১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। এতে মুসলিমরা বোমাফাটায় ও গুলি চালাতে শুরু করে। ৮ মে প্রশাসনের উদ্যোগে একটি শান্তি বৈঠকের ব্যবস্থা করলে মুসলিমরা ওই বৈঠক বয়কট করে। এইদিন পরিকল্পনা মাফিক হিন্দুদের জমির ধান মোষ দিয়ে খাওয়াতে শুরু করে। ফলে হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে

(এরপর ৪ পাতায়)

পশ্চিমবঙ্গে ৩২ বছরের উন্নয়ণ

আধপেটা খাওয়ার বিচারে ওড়িশার সঙ্গে একাসনে পশ্চিমবঙ্গ

বিশেষ সংবাদদাতা।। জাতীয় নুমনা সমীক্ষা---২০০৭-এর তথ্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের ১০.৬ শতাংশ গ্রামীণ মানুষ অর্ধেক বছর না খাওয়ার তালিকায় দেশের প্রথম স্থানে রয়েছে। সারাবছর আধপেটা খেতে পাওয়া সংখ্যার বিচারে (১.৩ শতাংশ) ওড়িশার সাথে যুগ্মভাবে দ্বিতীয়স্থানে। শহরের অনাহারে থাকা পরিবারের সংখ্যার বিচারে (০.৬ শতাংশ) তৃতীয় স্থানে। রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকের মধ্যে ৮২টি ব্লকে মানুষের ন্যূনতম খাবার জোটে না। রাজ্যের ৪৭.৩ক্ষ মানুষের রেশন বা বিপিএল কার্ড নেই। পুষ্টির একটি প্রধান সূচক হল Body Mass Index (BMI) -এর হিসেবে এই রাজ্যের স্থান ২৫টি প্রধান রাজ্যের মধ্যে ২৪ নম্বরে। শিশুদের রক্তাল্পতার আধিক্যে ২৫টি প্রধান রাজ্যের মধ্যে এই রাজ্য ১৯তম স্থানে। তিন বছরের নীচে গ্রামে অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় ভুগছে এমন শিশুর সংখ্যা রাজ্যে ৮২%। এক্ষেত্রে জাতীয় গড় ৭৪%। দেশের মধ্যে এই রাজ্যে ম্যালেরিয়ায় মৃতের হার দ্বিতীয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশ রয়েছে প্রতি ৩০০ জনের চিকিৎসার জন্য একটি বেড। কিন্তু এই রাজ্যে ১১৫০ জন পিছু ১টি বেড। রাজ্যের জি ডি পি-র মাত্র ০.৮৭ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ। আর মাথাপিছু মোট উৎপাদনের (GDP) নিরিখে পশ্চিমবাংলা ভারতে ১৮তম রাজ্য। প্রাথমিক শিক্ষায় ৩৫-এর মধ্যে ৩৩ তম। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকের মধ্যে স্কুলছুট ৭৮.০৩%। নারীধর্ষণ ও নারীপাচারে ভারতে সর্বোচ্চ দুটি জেলা এই রাজ্যে। শ্রমিকদের PF ও ESI-এর টাকা মেরে দেওয়ায় এরাজ্য প্রথম।

ন্যূনতম বাসভাড়া সারা ভারতের সমস্ত মহানগরীর মধ্যে কলকাতায় সর্বাধিক। রাজ্যে ৫৫ হাজার কলকারখানা বন্ধ। যে কারণে প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন। অপরদিকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ভারতে প্রথম, ৭৭.২ লক্ষ। শিশুমৃত্যুর হারে পশ্চিমবাংলা প্রথম। শৌচাগারহীন গ্রামীণ পরিবার ৭৮ক্ষ এবং চিকিৎসার জন্য ঋণগ্রস্ত পরিবার ৪২ক্ষ। উন্নততর বামফ্রন্টের শাসনের উন্নতির হিসেব জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা রিপোর্ট ২০০৮ থেকে জানা গেছে---১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সেই ভারতবর্ষের ১৬ শতাংশ মেয়ে গর্ভবতী হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই হিসেবটা ২৫ শতাংশ। ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ বিদ্যালয় শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সন্তান জন্মসময়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ৫ জন নবজাত শিশুর মধ্যে ২ জন মাত্র হাসপাতাল, নার্সিং হোম বা কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জন্মায়। বাকি ৩ জনের মধ্যে ৯০ শতাংশ কোনও ডাক্তার, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য পায় না। এজন্য এ রাজ্যে শিশুমৃত্যুর হারও সবথেকে বেশি। ভারতবর্ষে অপরাধ ২০০৭-এর জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে----২০০৬ থেকে ২০০৭-এ নারীধর্ষণ বৃদ্ধির জাতীয় গড় ৭.২ শতাংশ। ওই একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধির হার ২১.৭ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে তা ৩২.৬ শতাংশ। বড় শহরে পণের কারণে বধূহত্যা বৃদ্ধির সর্বভারতীয় গড় ১০.৭ শতাংশ। ইভটিজিং বা শ্লীলতাহানি বৃদ্ধির জাতীয় গড় ৫.৮ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে তা ২৪.২ শতাংশ।

শান্তির মরুদ্যানে পুলিশের পারদর্শিতায় যে সব অপরাধী আদালতের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পায়, তার ২২ শতাংশ ধর্ষক। ইভটিজিংয়ের অভিযুক্তদের খালাস পাওয়ার জাতীয় গড় ৭১ শতাংশকে পিছনে ফেলে পশ্চিমবঙ্গ ৮৭.৫ শতাংশ।

জাতীয় উন্নয়ণ সমীক্ষা ২০০৭ রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে---পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ৫৫ শতাংশ বাড়িতে শৌচালয় নেই। ৪% বাড়িতে (গ্রাম ৬৫%, শহর ৩০%) আজও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। পাইপে জল আসে মাত্র ১১ শতাংশ বাড়িতে। কলকাতা শহরেই ৩১% বাড়িতে জলের কল নেই। সারা রাজ্যের ৫৬% গ্রামের বাড়িতে জল নেই।

পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী রাজ্য সরকার ১৯৯৫ সালে দু-দফায় বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৭০১ কোটি টাকা এবং ২০০৬ সালে ডি এফ আই ডি'র কাছ থেকে ৭৪৫ কোটি টাকা ঋণ নেয়। সুদের বোঝা জনগণকে আজও বইতে হচ্ছে।

এই সময়

জাতীয় স্বার্থে

জাতীয় স্বার্থে দলের উপরে উঠতেও দ্বিধা করবে না ভারতীয় জনতা পার্টি। প্রয়োজনে কংগ্রেসকেও সঙ্গে নিতেকার্পণ্য করবে না বলে মন্তব্য করলেন লালকৃষ্ণ আদবানির অন্যতম সচিব সুধীন্দ্র কুলকার্ণী। দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। দেশের মধ্যে সাংবিধানিক সহ যে কোনও জটিল সঙ্কটে, তথা স্থায়ী সরকারের লক্ষ্যে যদি কংগ্রেসকে সমর্থন করতে হয়, তাহলে বিজেপি তা করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

পড়াশোনার প্রয়োজন

বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী যে সকল তথ্য তুলে ধরছেন, সেগুলি সম্পর্কে সঠিকভাবে আরও পড়াশোনা করা উচিত বলে মন্তব্য করলেন বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। হিমাচল প্রদেশে এক সমাবেশে শ্রীমতী স্বরাজ বলেন, 'অন্ত্যোদয় যোজনা' এবং 'সজলধারা' প্রকল্প এন ডি এ আমলে শুরু হয়েছিল। অথচ তা ইউ পি এ সরকারের অবদান বলে রাহুল গান্ধী নির্বাচনী সভাগুলোতে বেমালুম চালিয়ে যাচ্ছেন।

মুসলিম তোষণ

গোঁসা করেছেন সি পি এম নেতা শ্যামল চক্রবর্তী। সম্প্রতি এক বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমে তিনি বলেছেন, এরাজ্যের মুসলিমদের ভোট সিপিএমেরই পাওয়া উচিত। কেন্না তার বক্তব্য অনুসারে সারা ভারতে মাদ্রাসার জন্য যেখানে মাত্র ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ব্যয় করা হয় ২২৫ কোটি। সংখ্যালঘু মুসলিমদের এমন খুল্লামখুল্লা তোষণ যে অন্য কোনও দল বা রাজ্য করে না, প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা তথা পলিটব্যুরো সদস্য শ্যামল চক্রবর্তীর এই বক্তব্যেই তা স্পষ্ট।

তালিবানী সন্ত্রাস

পাকিস্তানে শিখদের ওপর তালিবানদের অত্যাচারের কঠোর বিরোধিতা করল অকালি দল। বর্তমানে পাকিস্তানে তালিবানরা জোরপূর্বক শিখদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করছে। ধর্মের নামে জোরপূর্বক জিজিয়া কর আদায়ের নিন্দা করেছে অকালি দল। গত ১০ মে দিল্লীর রাজপথে অকালি দল এর বিরোধিতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের মতে, পাক সরকারের এই বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পাকিস্তানে তালিবানি সন্ত্রাসের শিকার সেখানকার হিন্দু পরিবারগুলিও। অনেকেই তালিবানি সন্ত্রাসে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। যারা পাকিস্তানে, তারা এখন জীবন হাতে নিয়ে দিনযাপন করছে।

নকল আদালত

নকলের বিশ্ব ইতিহাস হল খোদ কলকাতায়। রাজধানী শহরের বুকেই গজিয়ে উঠেছিল নকল আদালত। দীর্ঘদিন নকল কাজও সামলেছে আদালতটি। প্রায় এক বছর ধরে। 'পার্মানেন্ট আরবিট্রাল ট্রাইবুনাল অফ ইন্ডিয়া' নামে একটি সংস্থার নামে চলত আদালতের কাজ। এই জাল আদালতের কর্মীরা গ্রাহকদের কাছ থেকে মোটা টাকাও উপার্জন করেছিল, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নাম করে। লালবাজার থানা বিষয়টি কোনও সূত্রে জানতে পারলে, ঘটনাটি সবার সামনে আসে। খোদ কলকাতার বুকে এই ধরনের ঘটনায় রীতিমতো তাজ্জব তারা।

নাটের গুরু

পাকিস্তানই নাটের গুরু। ভারতে সমস্ত জঙ্গি হামলার ছক পাকিস্তানের মাটিতেই তৈরি। তা ১৯৯৯-র হামলা হোক, বা ২৬/১১-র ঘটনা। জঙ্গিরা আক্রমণের নীল নক্সা পাকিস্তানে বসেই তৈরি করেছে। এমন তথ্য জানিয়েছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার অন্যতম উপদেষ্টা ব্রুস রিডেল। তিনি ওয়েবসাইটে এক সাক্ষাৎকারে একথা জানান। পাকিস্তানের জঙ্গিরা আবার ভারতে হামলা চালাতে পারে বলে মনে করেন তিনি। যাতে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে তিনি দুই দেশকেই সতর্ক করেছেন।

জাতীয় গ্রীড

রাজধানী ও তার নিকটবর্তী শহরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি তে আরও সক্রিয় উদ্যোগ নিল ভারতীয় বায়ুসেনা। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে চটজলদি ব্যবস্থা নিতে গঠন করা হচ্ছে 'জাতীয় গ্রীড'। বিশেষ সেনাবাহিনী ও জাতীয় সুরক্ষা গার্ড (এন এস জি)-এর কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠন করা হচ্ছে এই গ্রীড। যাতে মুম্বাই হামলার মতো ঘটনায়, দ্রুত শত্রুপক্ষের ওপর হামলা চালানো যায়। গ্রীডের বিষয়ে ভারতীয় বায়ুসেনা বাহিনী যথেষ্ট আশাবাদী।

অতিরিক্ত ব্যয়

ইউ পি এ সরকারের নিরাপত্তা খাতের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় হয়েছে চীন সীমান্তের নজরদারির কাজে। ৫ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে শুধুমাত্র সীমান্তের পাহারার জন্য। একাদশ ডিফেন্স প্লানের রিপোর্টে এই তথ্য উঠে আসে। একাদশ ডিফেন্স প্ল্যানেও চীন সীমান্তের জন্য আরও অতিরিক্ত খরচ ধার্য হয়েছে। বর্ডার পোস্ট সহ রোড নেটওয়ার্কের কাজে আরও অর্থ ও শক্তি লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার।

সিনেমা প্রীতি

ভারতবাসীর সিনেমাপ্রীতি নতুন নয়। দেশের মানুষের আয়ের একটা অংশ ব্যয় হয় সিনেমার পিছনে। সিনেমা- প্রেমীরা বছরে প্রায় ৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে থিয়েটারে। যা ভারতীয়দের উপার্জনের একটা বড় অংশ। বিনোদনের এই উপার্জন বাটোয়ারা হয় প্রোডিউসার ও থিয়েটার মালিকদের মধ্যে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। তবে এই ব্যয় শুধুমাত্র বলিউডের পিছনে। অর্থাৎ হিন্দী ছবির জন্য। কোনও আঞ্চলিক সিনেমায় নয়।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা

বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় তাহার সব শরিক দলগুলিকে লইয়া একটি বিশাল জনসভা করিয়া ফেলিল। আগামী সরকারের চেহারা কী হইবে সম্ভবত সেই অঙ্কটি মাথায় রাখিয়া শেষ দফা ভোটের আগেও জনসভা করিয়া জোটের সমৃদ্ধ চেহারা তুলিয়া ধরিতে তৎপর হইলেন এন ডি এ নেতৃত্ব। লুধিয়ানার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ৯ শরিক সহ বিজেপি এবং এন ডি এ শাসিত ৮ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্কেত হইল, মুলায়ম সিং যাদব, লালুপ্রসাদ, রামবিলাস পাসোয়ান, রামডসের মতো শরিক নেতাদের সঙ্গে বনিবনার অভাবে কংগ্রেস শিবির তথা ইউপিএ যখন ছত্রভঙ্গ, এন ডি এ তখন অটুট। শুধু তাহাই নহে, প্রকাশ কারাত, এ বি বর্ধনদের কার্যত বুড়ো আঙুল দেখাইয়া বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ শিবিরেই ভিড়িয়া গেল বামপন্থীদের সাধের তৃতীয় ফ্রন্টের শরিক অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টি আর এস)। লুধিয়ানার মঞ্চে উপস্থিত হইয়া টি আর এস সভাপতি কে চন্দ্রশেখর রাও ঘোষণা করিলেন, আমরা শুধু এন ডি এ -কে খোলা মনে সমর্থন করছি না, অন্যদেরও এই জোটে সামিল করিব। টি আর এস সভাপতির আনুষ্ঠানিকভাবে সামিল হওয়া বামেদের কাছে এক বড় ধাক্কা। ভোটের ফল প্রকাশের আগেই এক প্রস্থ শক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রীআদবানী বন্ধুভাবাপন্ন আঞ্চ লিক দলগুলিকে এই বার্তা দিতে চাহিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী লইয়া যখন কংগ্রেস তথা ইউপিএ-তে ঐক্যমতের অভাব তখন লুধিয়ানা বুঝাইয়া দিল এন ডি এ অটুট।

সেদিনের আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু ছিলেন অবশ্যই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে আঁচ পড়িতে পারে বলিয়া যে নরেন্দ্র মোদীকে বিহারে প্রচারেই যেতে দেন নাই বলিয়া যে রটনা হইয়াছিল, সেই মোদীর হাত ধরিয়া যখন তিনি জনতাকে অভিনন্দন জানাইলেন, তখন তাহা 'পিক অফ দ্য ডে' হইয়া উঠিল। যে নীতিশ কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন রাহুল গান্ধী, এবং উচ্ছ্বসিত পশ্চি মবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য এবং যাহার সমালোচনা করিয়া বীরাপ্পা মইলি-কে কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগের প্রধানের পদ খোয়াইতে হইয়াছিল, সেই নীতিশ কুমার যখন লুধিয়ানার মঞ্চ হইতে বিহারের প্রতি বঞ্চ নার অভিযোগ করিয়া কংগ্রেস তথা ইউপিএ সরকারের তুলোধুনা করেন, তখন যে তাহা এন ডি এ-কে নতুন করিয়া অক্সিজেন যোগাইল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

লুধিয়ানা এই বার্তাও দিল যে কেন্দ্রে এন ডি এ সরকার গঠিত হইলে শিরোমণি অকালি দল হইবে তাহার অন্যতম শরিক। পাঞ্জাবের উন্নয়ণের স্বার্থে যাহা সহায়ক হইবে। শিবসেনা নেতা মনোহর যোশী, অগপ নেতা চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, আর এল ডি নেতা অজিত সিং, আই এন এল ডি নেতা ওমপ্রকাশ চৌটালা প্রমুখের উপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই সভা সফল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে বিজেপি নির্বাচিত হইলে চন্দ্রবাবু নায়ডু, জয়ললিতা, নবীন পট্টনায়েক, চিরঞ্জীবীর মতো আঞ্চ লিক নেতাদের বৃহত্তর এন ডি এ-তে সামিল হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি বেশ জমজমাট হইয়া উঠিবারই সম্ভাবনা।

লুধিয়ানায় এন ডি এ-র এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রদর্শনী কিন্তু নির্বাচনের শেষপর্বে ভোটারদের জন্য নয়। এই শক্তির প্রদর্শনী রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের উদ্দেশ্যে একটি বার্তাও বটে। বিজেপি-র আশঙ্কা, নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে সাংসদদের সংখ্যা লইয়া ঘোট পাকানো হইতে পারে। নির্বাচন পূর্ব বৃহত্তম জোটকেই তাই প্রথমে সরকার গড়িবার জন্য রাষ্ট্রপতি আহ্বান জানান — এন ডি এ ইহাই আশা করে। শরিকদলগুলির এই বৃহত্তম সমাবেশকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়া এল কে আদবানী এন ডি এ-র ঐক্যবদ্ধ রূপ ও ইউ পি এ-র ছন্নছাড়া বৈপরীত্যটাই তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ইউ পি এ-র শরিক রাষ্ট্রীয় জনতা দল, লোক জনশক্তি পার্টি এবং সমাজবাদী পার্টি এখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। বিজেপি-র আশঙ্কা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ইউপিএ নতুন করিয়া জোট বাঁধিয়া নিজেদের বৃহত্তম জোট হিসাবে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। নরম মনোভাব সম্পন্ন রাষ্ট্রপতি যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসকে সরকার গড়িতে আহ্বান করেন এবং অন্যান্য দলের নিকট হইতে সমর্থন সূচক চিঠি সংগ্রহের কথা বলেন তাহা হইলে এবং অন্য দলের সহায়তায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদদের সমর্থন দেখাইতে পারে। তাই বিজেপি-র দাবি, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-পূর্ব বৃহত্তম জোটকেই সরকার গড়িতে আহ্বান করুন। লুধিয়ানার সভা এই বার্তাই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাইয়াছে।

কিন্তু বার্তা পাঠানো আর বার্তা সঠিক ভাবে অনুধাবন এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও স্বার্থের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়া তাহা আত্মপ্রত্যয় ও নিরপেক্ষতার সহিত প্রয়োগ করা এক কথা নয়। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম। সত্য স্থাপনের মধ্য দিয়াই ধর্মের সংস্থাপন হয়। সত্যের পালনে ধর্মের সংস্থাপনে ব্যক্তি মানসে দৃঢ়চিত্ততাই প্রধান শর্ত। নিরপেক্ষতা তাহার বাহন। চরিত্রে নিরপেক্ষতাই যদি না রহিল তাহা হইলে দৃঢ়চিত্ততায় কিবা প্রয়োজন।

সত্য পালনে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয়ার কাছে জাতি নিরপেক্ষতার আশা পোষণ করিতেই পারে। সত্য ও ন্যায় বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্ঠাবান থাকার নিশ্চ য়তার দাবি করিতেই পারে। কারণ তিনি তো জাতির দর্পণ। তাহার মধ্যেই জাতির প্রতিফলন। জাতির প্রতিচ্ছবি বিশ্ব মানব জাতির কাছে পৌঁছায় তাঁহার মাধ্যমে। জাতির সম্মান রক্ষার দায়িত্ব তাঁহারই। তিনি তাহা পালন করিবেন — ইহাই এখন আশা।

নেপালে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রচণ্ড কতটা আগ্রহী

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ)

পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার পর এবার নেপালে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। পুষ্পকুমার দহল (প্রচণ্ড) তার মাওবাদী কমিউনিস্ট সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে নেপালের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ -কয়েক বছর ধরে সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল নেপাল থেকে রাজতন্ত্রের অবসান। নেপালের এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হল। রাজতন্ত্র শেষ হল। নেপালের সংবিধান বাতিল হল।

প্রচণ্ড জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে নেপালে শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করলেন। বহু দলীয় গণতন্ত্র তিনি সমর্থন করলেন। তাঁর দাবি মতো নেপালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ২০টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল। প্রচণ্ডর মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, নেপালী কংগ্রেস, নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (সংযুক্ত মাও-লেনিন) দল এবং নবগঠিত মদেশী পিপলস্ রাইটস্ ফোরাম এবং সদ্ভাবনা পার্টি ইত্যাদি নির্বাচনে যোগদান করে। আন্তর্জাতিক চাপ এমনকী রাষ্ট্রসঙ্ঘও নেপালে গণতন্ত্র ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছিল। প্রচণ্ড তার সংগঠনের তরফ থেকে হিংসার রাজনীতি পরিত্যাগ করে নেপালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন। প্রশ্ন উঠেছিল প্রচণ্ডর পি এল এ সদস্যদের জীবিকার কি হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিদের সামনে প্রচণ্ড তার সশস্ত্র সৈনিকদের সংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়ে বলেছিলেন, গণতান্ত্রিক নেপালের প্রথম নির্বাচনে প্রচণ্ডর মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় জিতে এসে সরকার গঠন করেছিল। নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (ইউ এম এল) তাদের সরকারে যোগ দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সংসদ গঠিত হয়েছিল সংবিধান রচনার দায়িত্ব নিয়ে। আগামী বছর মে মাসের মধ্যে নতুন সংবিধান রচনা করে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল সাংবিধানিক সঙ্কট। যার ফলে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রচণ্ড ইস্তফা দিলেন এবং সরকার ভেঙ্গে গেল। বেশ কিছুদিন ধরেই প্রচণ্ড বর্তমান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল রুকমাঙ্গা কাটওয়ালকে বরখাস্ত করার প্রয়াস করছিলেন। সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, প্রমোশন এবং বিভিন্ন পদে পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগ তিনি তুলেছিলেন। কেন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে না, সেবিষয়ে কারণ দর্শানোরও চিঠি পাঠিয়েছিলেন। জেনারেল কাটওয়াল তার উত্তরও দিয়েছিলেন এবং যে কোনও তদন্তের মুখোমুখি হতে ও সরকারি আদেশ পালনের কথাও বলেছিলেন। মন্ত্রীসভায় প্রচণ্ডর সহকর্মীরা এবিষয়ে প্রচণ্ডের সঙ্গে সববিষয়ে সহমত পোষণ করেননি। কিন্তু আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সহমতে আসার প্রয়াস না করে, তিনি জেনারেলকে বরখাস্ত করার আদেশ দেন। টেলিফোনে তিনি সেনাবাহিনীর সর্বপ্রধান রাষ্ট্রপতি ডঃ রামবরণ যাদবকেও তা জানান। জেনারেল কাটওয়াল এই আদেশ পেয়ে অন্য সিনিয়র জেনারেলদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং বিচার-বিভাগের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইত্যবসরে রাষ্ট্রপতি ডঃ রামবরণ যাদব সেনাধ্যক্ষকে স্বপদে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর আদেশ রদ করে, আদেশটি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকুমার দহল এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, তাঁর আদেশ যে নাকচ হতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারেননি। মাওবাদী প্রচণ্ড গোড়া থেকেই ভারতের পরিবর্তে চীনের দিকেই বেশি ঝুঁকে ছিলেন। আন্দোলনের সময় তিনি নিশ্চ য়ই চীন থেকে নৈতিক এবং অস্ত্র উপকরণের সাহায্য পেয়ে এসেছেন এবং সম্প্রতি চীনের সঙ্গে 'শান্তি এবং বন্ধুত্বের' চুক্তি সাক্ষর করেছেন। চীন কাঠমাণ্ডুতে বিদ্যুৎ ঘাটতি দূর করে, আলোর বন্যা বইয়ে দেওয়ার কথা বলেছে। শুধু একটাই শর্ত — তিববত থেকে বিক্ষুব্ধদের ভারতে পালিয়ে যেতে যেন নেপালের ভূমি ব্যবহার করতে দেওয়া না হয়। ঘটনাচক্রে জেনারেল কাটওয়াল ভারতের সৈন্য একাডেমি থেকে পাস করেছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন।

নেপাল সরকারের পতন এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ নেপালের রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মাওবাদীরা নেপালের বিভিন্ন অঞ্চ লে, বিশেষ করে কাঠমাণ্ডুতে বিরোধ প্রদর্শন করেছে। মাওবাদীরা ভারত বিরোধী স্লোগান দিচ্ছে। প্রচণ্ডর মাওবাদী সহযোগী শ্রীভট্টরাই সরাসরি ভারতকে দায়ী করেছেন রাষ্ট্রপতি ও সেনাধ্যক্ষের এই আচরণের জন্য। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র রাষ্ট্রপতির এই ভূমিকারও সমালোচনা করেছে। তারা মনে করে রাষ্ট্রপতির পদ একটা অলঙ্কার মাত্র। প্রধানমন্ত্রীর আদেশ তাঁর পক্ষে খারিজ করার অধিকার নেই। একটা কথা তাঁরা ভাবছেন না, যে মন্ত্রীসভার যে কোনও আইন বা আদেশ রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতেই পারেন। কিন্তু নেপালের নতুন সংবিধান এখনও রচিত এবং গৃহীত হয়নি। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন বহু দলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে নিয়ম মেনে চলা হয় (কনভেনশন), সেটা এক্ষেত্রে মেনে চলা উচিত। নেপালের নতুন সংবিধান রচিত হলে, আশা করা যায় বর্তমানের উদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্গদর্শন করা হবে। রাষ্ট্রপতি ৯ মে-র মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলিকে নতুন সরকার গঠনের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। সত্বর নেপাল আবার নতুন জাতীয় সরকার গঠন করে গণতান্ত্রিক পথ ধরে রাখতে সক্ষম হবে কিনা, ঘটনা প্রবাহ কোনদিকে যায় সমগ্র বিশ্ব সেইদিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এই রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে নেপালে একটি সিডি আত্মপ্রকাশ করেছে। সিডি-র বিষয়বস্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ডকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগ দান করে নেপালে স্থায়ী শান্তি ও প্রগতি আনার কথা বললেও, তাঁর আসল উদ্দেশ্য নেপালে একদলীয় মাওবাদী শাসন প্রবর্তন করা। সিডি দেখার সুযোগ হয়নি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে বিবরণ বেরিয়েছে, তারই ভিত্তিতে জানা যায় যে, তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিদের সশস্ত্র মাওবাদীদের যে সংখ্যা জানিয়েছিলেন তা অন্তত প্রকৃত সংখ্যার তিনগুণ বেশি। তিনি সামরিক বাহিনীতে রাজনীতিকরণের পক্ষপাতি এবং আশা করেন ৩০০০ মাওবাদী সৈনিক হিসাবে সামরিক বিভাগে যোগদান করার সুযোগ পেলে, অচিরেই নেপালী সামরিক বাহিনীর ৯৫০০০ সৈনিকের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। সামরিক বাহিনীতে মাওবাদীকরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিচার বিভাগকেও মাওবাদী কর্তৃত্বের নীচে অর্থাৎ সরকারি প্রভুত্বের আওতায় আনবেন এবং কিছু অমবুডস্ম্যান (Ombudsman) নিয়োগ করে তাদের বিচার বিভাগীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন। এককথায় সরকারের বাইরে থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে যে পরিবর্তন আনতে বহু বছর লেগে যাবে সরকারি ক্ষমতায় থেকে তা অনেক সহজেই করা সম্ভব হবে।

পুষ্পকুমার দহল অবশ্য এই সিডি-র তথ্য অস্বীকার করেছেন এবং বহুদিন আগে তাঁর বিভিন্ন স্তরে দেওয়া ভাষণের বিভিন্ন অংশ সংযোজিত করে এই সিডি প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেপালে শান্তি ও প্রগতির পক্ষপাতি।

ঘটনা যাই-ই হোক, নেপালের বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণ এবং জাতীয়

(এরপর ৪ পাতায়)

" নেপালকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পথে প্রগতির পথে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভারতকে সর্ব বিষয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অন্যথায় তিব্বতের মতো নেপালের কিছু অংশ চীনের কুক্ষিগত হয়ে পড়লে, শুধু ভারতই নয় রাষ্ট্রসঙ্ঘও কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। "

শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের ভাঁওতা ফেরি করছে সি পি এম

নবকুমার ভট্টাচার্য।। পশ্চিমবঙ্গে এখন নাকি উন্নয়ণ হচ্ছে। আমরা অধম বাঙালী গ্রামে শহরে জঙ্গলে নদীতে বন্দরে কাজে-অকাজে, শয়নে স্বপনে যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন শুনছি শিল্পায়ন হচ্ছে। এবার নাকি কর্মসংস্থানের বন্যা বয়ে যাবে। ভোটের বাজারে দেওয়ালে পোস্টারে লেখা হচ্ছে নয়াচরে নাকি ১১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু রাজ্যের বিরোধী দল উন্নয়নের বিরোধী, সেজন্য শিল্পের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু এতেও শিল্পায়ন থেমে থাকবে না।

পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া দেখে অথবা চোখের সামনে রাজারহাট নিউটাউন দেখে কেউ হয়তো বলবে শিল্পায়ন। হচ্ছে আবার আমলাশোল, লালগড়, পুরুলিয়ার অনাহার মৃত্যুর মিছিল দেখিয়ে কেউ বলবে উন্নয়ন কোথায়? সল্ট লেকের সেক্টর ফাইভ দেখিয়ে, কেউ বলবে কর্মসংস্থানের বন্যা বইছে, আবার ভাগীরথীর বিস্তীর্ণ দু'পারের নিভে যাওয়া চিমনি দেখে কারও বক্তব্য কর্মসংস্থান কই, এতো কর্মচ্যুতি।

১৯৭৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ভারতের শিল্পোৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ও অবদান প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে—বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সময় অর্থাৎ ১৯৭৭-৭৮ সালে মোট শিল্পোৎপাদনে রাজ্যের কলকারখানার অংশ ছিল ১০.৫ শতাংশ। আজ দেশ যখন মুক্ত অর্থনীতির পথ গ্রহণ করেছে, তখন জ্যোতি-বুদ্ধের হাতযশে এটা নেমে দাঁড়িয়েছে ৩ শতাংশে। ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট রেজিস্টার্ড কারখানা ছিল ৫৩৬৯ টি এবং এতে প্রায় ৯ লক্ষ ১৮ হাজার মানুষ কর্মরত ছিল। ২০০১ সালে কারখানা বেড়ে ৬০৯১ হলেও কর্মরতদের সংখ্যা কমে হয়েছে ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার। এর মধ্যে উল্লেখ্য, এই ৬০৯১-র মধ্যে ২৫২টি রুগ্ন। বুদ্ধবাবুর আমলে শিল্প বিবাদের জন্য ২০০১ সালে ২১২ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে। ২০০২ সালে ২১৮ লক্ষ, ২০০৩ সালে হয়েছে ২৬৪ লক্ষ, ২০০৪ সালে ২৭৬ লক্ষ এবং ২০০৫ সালে হয়েছে ২০৬ লক্ষ। আবার ২০০৬ সালে ২৭৫ লক্ষ। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৭ সালে ধর্মঘট হয়েছিল ২০৬ এবং লক আউট ১৯১। ২০০০ সালে ওই পরিসংখ্যান গিয়ে দাঁড়ায় ধর্মঘট ২৭ এবং লক আউট ২৮০। ২০০৪ সাল ধর্মঘট ২০ আর লক আউট ৩৫ আর ২০০৬-এ এই সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯ এবং ২৬৫-তে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এখন আর শ্রমিক আন্দোলনে কলকারখানা বন্ধ হয় না, হয় লক আউট। নিন্দুকেরা অবশ্য বলেন এমন মালিকদরদী সরকার ভারতে একটিও নেই।

পশ্চিমবঙ্গে কারখানা শ্রমিকদের আজকের চিত্র সরকারি নথি থেকে জানা যাচ্ছে----১৯৯৪-৯৫ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ১৪.৩১১ টাকা থেকে বেড়ে ২০০৪-০৫-এ হয়েছে ২৪.৫৯৩ টাকা অর্থাৎ শ্রমিক প্রতি উৎপাদন বেড়েছে ১০.০০০ হাজার টাকা। কিন্তু বাড়তি লাভ গেছে মালিকের পকেটে। কর্পোরেট সেক্টারে ১৯৯৮-৯৯-তে শতকরা ৮.১৪ ভাগ ছিল কর্মীদের বেতন, ২০০৪-০৫-এ তা হয়েছে কমে ৬.৯ শতাংশ।

এরাজ্যে ২০০৬ সালে ৪,৯৭,০০০ জন চাকরির জন্য এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত করিয়েছিলেন। কিন্তু চাকরি পেয়েছেন ১৫,১০০ জন। বলা হয়েছিল হলদিয়ায় চাকরি হবে দেড় লক্ষ, কিন্তু কি হয়েছে হলদিয়ার? হলদিয়া পেট্রোকেমিকালে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে চাকরি পেয়েছে মাত্র ৬০০ জন। বিধানসভায় ২৮ নভেম্বর ২০০৬-এ পেশ করা সরকারেরই স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট এই তথ্য দিয়ে বলছে, হলদিয়ার অনুসারী শিল্পে কাজ পেয়েছে আরও যোলোশো মানুষ।

বাম সরকার বলছে, শিল্পায়ন হলেই কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু বামপন্থী অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়কের মতে, বর্তমান সময়ে শিল্পপতিদের লক্ষ্য 'লেবার সেভিং ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ' নীতির প্রয়োগ। অর্থাৎ কম শ্রমিক দিয়ে বেশি উৎপাদন এবং কম শ্রমিক নিয়োগে সমস্যার ব্যাপকতা কমানো।

রাজ্যে কর্মসংস্থানের এমনই হাল। গ্রামবাংলায় দৈনিক ১২ টাকাও রোজকার করতে না পারা মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ২২ হাজার। পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ৮ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে দৌড়োয় ২,০৯,৯৫০টি পরিবার।

উপরোক্ত সরকারি তথ্যাবলী থেকেই বোঝা যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নতি হয়নি, কোনও বড় শিল্পও গড়ে ওঠেনি। শিল্পের জন্য বন্ধ কারখানার জমি, পতিত জমি, অকৃষি জমির অভাব নেই। তবু শিল্পের জন্য উর্বর কৃষিজমি, তিন-চার ফসলি জমি দিয়ে পুঁজিপতিদের সেবা করা হচ্ছে। এখন একটা কথা বাজারে খুব চালু হয়েছে। কথাটি হল, জমিতে না হয়ে শিল্প কি আকাশে হবে? মূলধনের কতটা সদ্ব্যবহার হচ্ছে সেটাও তো বুঝে নিতে হবে। যাদের জমি জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহার হচ্ছে, সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাঁদের আনুপাতিক মূলধনী শেয়ারের কথা বলা হচ্ছে না কেন? শিল্পায়ন বলতে যা বোঝায় তেমন উদ্যোগ এরাজ্যে নেওয়া হয়েছে কি? এলোমেলোভাবে কিছু প্রকল্প যার বেশির ভাগই শিল্পপদবাচ্য নয়, তাকেই শিল্পায়ন বলে চালানো হচ্ছে। যেমন উপনগরী, ফুড-পার্ক, আই টি হাব, প্রমোদকানন ইত্যাদি। শিল্পনগরী আর উপনগরী কি একই শ্রেণীভুক্ত? শিল্পনগরী মানে এক বা একাধিক শিল্পকে ঘিরে জনবসতি এবং জনসমষ্টি সংশ্লিষ্ট শিল্পের কোনও না কোনও কাজে নিযুক্ত। আর উপনগরী স্রেফ প্রোমোটারি। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রোমোটার-রাজকেই শিল্পায়নের নামে অভিহিত করা হচ্ছে। আর এই ভুয়ো শিল্পায়ন নিয়েই প্রচারের এত ঢোলবাদ্য।

নেপালে প্রকৃত গণতন্ত্র

(৩ পাতার পর)

সরকার গঠন করে প্রয়োজনে সর্বদলের সিপিএন-মাওবাদীদেরও আবার সরকারে ফিরিয়ে এনে স্থিতাবস্থা পুনর্বহাল করার আশু প্রয়োজন রয়েছে। ভারত বর্তমানে সংসদীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভারত সরকারের সমস্ত মন্ত্রী এবং পার্টির বরিষ্ঠ নেতারা সম্পূর্ণ ব্যস্ত। এমতাবস্থায় কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে ভারত এই স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনায় কতটা সাহায্য করতে পারবে ধারণা করা সম্ভব নয়।

ভারত ও নেপালের সম্পর্ক হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক এবং জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে সেই আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। চীন তার ভারত বিরোধী আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে সেই সম্পর্কে চিড়ধরানোর প্রয়াস করছে এবং সেই প্রয়াস যে অনেকটা ফলপ্রসূও হয়েছে তার প্রকাশও দেখা যাচ্ছে। ভারতের বন্ধুত্ব ভুলে অন্যথায় কাঠমাণ্ডুর আকাশে-বাতাসে মাওবাদীদের ভারত বিরোধী স্লোগান এমনভাবে সোচ্চার হওয়ার কথা নয়। প্রকৃত বন্ধুকে চিনে নিতে নেপালের সেইসব মাওবাদীদের হয়তো কিছুটা সময় লাগবে। কিন্তু নেপালকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পথে প্রগতির পথে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভারতকে সর্ব বিষয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অন্যথায় তিব্বতের মতো নেপালের কিছু অংশ চীনের কুক্ষিগত হয়ে পড়লে, শুধু ভারতই নয় রাষ্ট্রসঙ্ঘও কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির দেওয়া সময়সীমা শেষ হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য কোনও সর্বসমর্থিত নাম পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক প্রয়াস জারি থাকলেও মাওবাদীদের সমর্থন ছাড়া কোনও স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন সহজ হবে না। রাষ্ট্রপতি সংসদকে অনুরোধ জানিয়েছেন দ্রুত এবিষয়ে কোনও সহমতে আসতে। প্রচণ্ড সেনাবাহিনীর যে আটজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অফিসারের বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ দিয়েছিলেন কোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করায় সরকার ডিভিশন বেঞ্চে আপীল করেন। ডিভিশন বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

প্রচণ্ড জানিয়েছেন, কয়েকটি বিদেশী শক্তির নেপালের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, সামরিক বাহিনীর গণতান্ত্রিক সরকারের উপর প্রভাবী হওয়ার বিরুদ্ধে এবং রাজশক্তিকে নেপালে পুনর্বহাল করায় কিছু মানুষের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর ভারত বিরোধী মনোভাব খুবই স্পষ্ট। এমতাবস্থায় মাওবাদীদের কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ (Splinter group) যদি আবার আলাদা হয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের পথ অবলম্বন করে, তাহলে নতুন করে নেপালে অশান্তির আগুন জ্বলবে।

আশা করব অবস্থা অতদূর গড়াবে না। প্রচণ্ডকে বুঝতে হবে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ সবাইকে নিয়ে সহমত গড়ে চলার পথ।

মালদার গ্রামে হিন্দুদের ওপর হামলা

(১ পাতার পর)

প্রতিবাদ করে। ৮ মে মুসলিমরা হঠাৎ মসজিদের মাইক থেকে ঘোষণা করে যে ৪ জন মুসলিমকে হিন্দুরা কেটে ফেলেছে এবং মসজিদ আক্রান্ত। আপনারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ধর্মরক্ষার জন্য বেরিয়ে আসুন। আলাল অঞ্চলের বেশিরভাগ গ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় এই গুজবে হাজার হাজার মুসলিম এন এইচ ৮১ ধরে আলাল ব্রিজ দিয়ে সাইকেল, মটর সাইকেল, ট্যাক্সি, পিক আপ ভ্যান ও ম্যাটাডোরে করে কাতারে কাতারে মুড়িয়াকুণ্ডু গ্রামের দিকে ছুটে আসে। আশপাশের হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে, মেয়েদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে এই গুজব পার্শ্ববর্তী চাঁচল থানার খানপুর, গোয়ালপাড়া, গোবিন্দপুর, জালালপুর, হরিশচন্দ্রপুর এবং রতুয়া থানার বিভিন্ন মুসলিম গ্রামে পৌঁছে যাওয়াতে, সেখান থেকেও হাজার হাজার মুসলিমরা রাত্রে আলালের পার্শ্ববর্তী মুসলিম গ্রামগুলিতে সমবেত হয় এবং হিন্দু বাড়ি আক্রমণের জন্য তৈরি হয়। হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে পুলিশ প্রশাসনের শরণাপন্ন হয়। পুলিশের একটি জিপ আসলে, তা ভাঙচুর করে দুস্কৃতীরা। এর পর ডি এস পি মালদা বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হয়। সঙ্গে বি এস এফ আসে। লাঠি চার্জ করে তখনকার মতো পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। কিন্তু হিন্দু গ্রামগুলির মহিলারা মান-সম্মান রক্ষার জন্য দরজা-জানলা বন্ধ করে রাত জেগে কাটায়। মহানন্দা নদীর ওপারের মুসলিমরা ও বহিরাগত মুসলিমরা সারারাত ধরে খাওয়া-দাওয়ায় মেতে থাকে। তারা বাংলাদেশ বানাবে বলে আওয়াজ দেয়। দু'দিন ধরে হিন্দুরা সংগঠিত হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।

ওদিকে মুসলিমরা মুহুর্মুহু বোমা ফাটিয়ে তাদের শক্তি জাহির করে। শেষে প্রশাসন থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। মাইক দিয়ে গুজব যারা ছড়াচ্ছে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলে কিছুটা শান্তি হয়। উল্লেখ্য, গাজোল থানার এই মুড়িয়াকুণ্ডু গ্রামের শিব মন্দিরে গত ১ ফেব্রুয়ারি মুসলিমরা গরুর মাংস ফেলে অপবিত্র করেছিল।

বর্তমানে পুলিশের প্রহরা থাকলেও পুলিশ চলে গেলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। হিন্দুগ্রামগুলিতে গিয়ে দেখা গেল, সকলের মধ্যে রাত্রি জাগা এবং চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ সুস্পষ্ট। ইঁটবাঁধা গ্রামের অধিবাসীরা তাদের গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর অনুরোধ করে। বোম হাতে মুসলিমরা হিন্দুদের ভয় দেখাচ্ছে। পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলেও হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

মাওবাদী প্রচণ্ড র ভারত বিরোধিতা

(১ পাতার পর)

অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ভারতের কোনও শত্রু দেশের হাত রয়েছে। কারণ নেপাল যে আই এস আই এজেন্টদের বড় ঘাঁটি তা নিয়েও সন্দেহ নেই। মাসুদ আজাহারকে মুক্তির জন্য আই এস আইয়ের মদতে পাক জঙ্গিরা নেপাল থেকেই ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান ছিনতাই করেছিল। কোনও মাওবাদী সরকার যে ভারতবন্ধু হতে পারে না তা নিয়ে আর এস এস বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। এখন তা প্রমাণিত হয়েছে।

নেপালের সেনাপ্রধানকে সারানোর ইস্যুতে প্রচণ্ড পদত্যাগ করেছে। এখন নেপালে নতুন সরকার গড়ার তোড়জোড় চলছে। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড প্রতিদিন নিয়ম করে ভারত বিরোধী মন্তব্য করে চলেছেন। প্রচণ্ড ক্ষমতায় আসার সময় এখানকার সিপিএম গদগদ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন চুপ। সীতারাম কিংবা বুদ্ধদেবের মুখে কোনও বুলি নেই। দেশ বিরোধী শক্তিদের অতীতেও সিপিএম মদত দিয়েছে।

নেপালের ঘটনায় তা আরও একবার প্রমাণিত হল।

দিল্লীর মনসদ কার

(১ পাতার পর)

পাতিল রাষ্ট্রপতি পদের সাংবিধানিক মর্যাদা কীভাবে রক্ষা করবেন সেটাই দেখার। কংগ্রেস দলীয় রাজনীতির উপরে উঠে দেশের সর্বোচ্চ পদের নিরপেক্ষতা তিনি কতটা বজায় রাখতে পারেন সে পরীক্ষাই এবার রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলকে দিতে হবে।

নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হানাহানির তীব্র আশঙ্কা

নিশাকর সোম ।। এই কলামে বহু পূর্বেই লেখা হয়েছিল যে এই রাজ্যে দুই যুযুধান গোষ্ঠীর মারমুখী সন্ত্রাসবাদী নীতির প্রয়োগের ফলে এক নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে চলেছে। দ্বিতীয় পর্ব নির্বাচনের দিন থেকে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, মেদিনীপুর, বীরভূম জুড়ে সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ১০-১৫ জন নিহত হয়েছে — শিশু, নারীও বাদ যায়নি। ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচনী নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বুথ দখল, রিগিং, লাইনে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সিপিএম-এর অভিযোগ বিরোধীরা নন্দীগ্রামে ৬০টি বুথ দখল করেছিল। বিরোধী দল বলছে, সিপিএম ৪৩টি বুথ দখল করেছিল। সিপিএম-এর অবস্থা অতীব করুণ। তারা নন্দীগ্রামে কোনও বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারেনি। দলে দলে সিপিএম কর্মী সমর্থক বলছে তাঁরা সিপিএম-এর বিরোধী হবেন! সুভাষ চক্রবর্তীর গোষ্ঠী নির্বাচনী কাজে অংশগ্রহণ করছে না। এই কলামে বারবার লেখা হয়েছিল যে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগ শুধু আর এস এস, স্বস্তিকাকে ওয়াচ করতে ব্যস্ত। অন্য জেলায় ফুটো বড় হচ্ছে।

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

নয়াচরেও আর একটি জঙ্গলমহল তৈরি হচ্ছে। ব্যর্থ পুলিশ, ব্যর্থ পুলিশমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রীর বদল দরকার। রানাঘাট-এ সিপিএম-এর পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ অলকেশ দাশ নাকি বিরুদ্ধেই কাজ করেছেন।

এই অবস্থা বামফ্রন্টের শরিক দল আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সি পি আই নেতৃবৃন্দ খুবই উপভোগ করছেন। আর তলাতে বামফ্রন্টের শরিকদলগুলির কর্মী সমর্থকগণ সিপিএম-কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিরোধী শক্তিকে মদত দিচ্ছেন।

দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর এবং মালদহে সিপিএম-এর আশা ক্ষীণ। হাওড়া জেলাতে উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে সিপিএম-এর জয় সম্পর্কে বিরাট প্রশ্ন উঠেছে। ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নেতা মন্ত্রীরা সিপিএম-কে হারানোর কথা প্রকাশ্যে বলেছেন। আর হান্নান মোল্লা তো নির্বাচিত হয়ে এলাকা ছেড়ে রাজস্থানে পার্টিকে জেতানোর কাজে ব্যস্ত থাকেন। শোনা যায়, তিনি কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে বসে নানান কাজ করে দেন। তাই তাঁকে পরিবর্তন করতে সাহস পায়নি রাজ্য সিপিএম নেতৃত্ব।

দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের রুপোলি ঝিলিক হল কৃষ্ণনগরে সত্যব্রত মুখার্জি-র লড়াই। এ-কথা বলা যায়, এ কেন্দ্রে কী হবে এক্ষুনিই কেউই বলতে পারবে না। আর দুই যুযুধান গোষ্ঠীর সন্ত্রাসের মাঝে একমাত্র বিজেপিই শান্তির বাহক। আজ তারা হয়তো বা বিরাট নয়। কিন্তু আগামী দিনে এটাই বিকল্প হবে।

তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে ডায়মন্ড-হারবার-এ সিপিএম-এর ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রতিটি কেন্দ্রে সিপিএম কোণঠাসা। কলকাতার একটি কেন্দ্রে সিপিএম-এর পরাজয় সুনিশ্চিত। অপরটিতে সিপিএম এর জয় সম্পর্কে এখন ধোঁয়াশা বিরাজ করছে। তৃতীয় পর্যায়-এর নির্বাচনে ব্যাপক হাঙ্গামা, সন্ত্রাস হবেই। নির্বাচনের পরে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হানাহানি শুরু হবেই। সময় থাকতে সাধু সাবধান। কালের যাত্রার ধবনি শুনতে কি পাওয়া যাচ্ছে?

রাজনৈতিক রোষানলে ভস্মীভূত মাথা গোঁজার আস্তানাটুকু।

রাজ্যে রক্তের অভাব বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাজ্যে রক্তের অভাব ক্রমশ বাড়ছে। অনান্য বছরের তুলনায়, এবছরে রক্তের যোগানও কম। গরমের কারণে অনেকেই রক্ত দিতে চাইছেন না। তার ওপর লোডশেডিংয়ের ফলে ইতিমধ্যেই ২৮০০ইউনিট রক্ত নষ্ট হয়েছে। তবে এসব সমস্যার থেকেও বড় সমস্যা লোকসভার ভোট। রাজ্যে রক্তের চাহিদা মূলত পূরণ করে বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-গুলো এখন ব্যস্ত। ফলে রক্তদান শিবিরের কর্মসূচী মার খাচ্ছে। গত বছর যেখানে রাজ্যে এই সময়ে ৩০০টি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়েছিল, এবছর তা অনেক কম। এখনও পর্যন্ত তা ৩০ টির থেকে একটু বেশি। সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের এক সূত্র অনুযায়ী, মূলত ভোটের কারণেই রাজ্যের ৪০টি রক্তদান শিবির বাতিল হয়ে গেছে। রাজ্যের ৫৬টি সরকারি ও ২০টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্ত সংগ্রহের কাজ করে থাকে। রক্তের যোগান কমায় তারাও রীতিমতো চিন্তিত। রক্তের অভাবে সব থেকে বেশি সমস্যার মুখে পড়েছেন থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, ব্লাড ক্যানসারের রোগীরা। যাদের মাসে ২-৩ বার রক্ত আবশ্যিক। রক্তের সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের প্রচার আধিকারিক কমল দত্তও।

এরাজ্যে রক্তের অভাব বরাবরের। পরিকাঠামোর অভাবে প্রয়োজনীয় রক্তও নষ্ট হয়ে যায়। বেশিরভাগ স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই জেনারেটর নেই। নেই রক্ত সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।রাজ্যবাসীর মধ্যে সচেতনতারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অনেকে সঙ্কোচ বা ভয়ে রক্তদান করতে চায় না।

অ ঢ রকম

বিশ্বাসের সম্মার্জনী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এক মাস আগে পর্যন্ত কেউ ভাবতেই পারেনি কমলবাবুর মেয়ে সুস্থ হবে। কম ডাক্তার-বদ্যি দেখানো হয়েছে! তবুও রোগ সারার নাম-গন্ধ ছিল না। কম কষ্ট সহ্য করতে হয়নি তাকে। ত্বকের জ্বালা মেটাতে যে যা বলেছে, তাই চোখ-মুখ বুজে করে গেছে। তবুও কিছুই লাভ হয়নি। সমস্যা যেমনকার তেমনই থেকে গেছে। বড়-বড় ডাক্তারও দেখানো হয়েছিল। নামি-দামি ওষুধও ব্যবহার করা হয়েছে। কিছুতেই কিছু না হওয়ায়, হতাশায় কমলবাবু সবকিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন নিয়তির ওপর। একদিন ঘটনাক্রমে জানতে পারলেন এক আশ্চর্য নিরাময় পদ্ধতির কথা। ভগবান শিবের মন্দিরে শিবের শিরে সন্মার্জনী বোলানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন পাশের গ্রামের এক ভদ্রলোক। প্রথমটা শুনে চমকে উঠেছিলেন। ভগবানকে ঝাঁটা? রীতিমতো তাজ্জব লেগেছিল তার। অবশেষে সেখানে পুজো দেওয়ার পরই সুস্থ হয়ে উঠেছে তার মেয়ে। ত্বকের সব রোগ সেরে গেছে। দেখলে বোঝার জো নেই আগে রোগ ছিল কিনা। উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের ছোট্ট গ্রাম সদতবতি। এখানেই শতবর্ষ প্রাচীন ভগবান মহাদেবের পাতালেশ্বর মন্দির। এখানে পূজা দিলেই সেরে যায় ত্বকের ব্যামো। নিরাময় পাওয়া যায় যে কোনও চামড়ার রোগ থেকে। বড়-বড় ডাক্তার, নামি-দামি কোম্পানীর ওষুধও ফেল শিবের কাছে। তবে এখানের পুজোর পদ্ধতিটা একটু আলাদা। অন্যরকম। ভিন্নধর্মী। পূজার রেকাবিতে শুধু ফুল -ফল নয়। সঙ্গে রাখতে হয় সম্মার্জনী। সম্মার্জনীতেই সন্তুষ্ট হন দেবাদিদেব। ভক্তের ভগবান এতেই প্রসন্ন। শিবলিঙ্গে সম্মার্জনী ঠেকালে মুক্তি পাওয়া যায় ত্বকের সমস্যা থেকে। চামড়ার রোগ নিরাময়ে তাবড়-তাবড় বিউটি-পার্লারিস্টরাও ভিড় জমায় মন্দিরে। পুজো দিতে আসে ৭ থেকে ৭০। তেমনি আসে প্রথমা থেকে তিলোত্তমা সবাই।

প্রতি সোমবারে ভক্তের ভিড় বাড়ে। ভগবান মহাদেবের জন্মবার--- সোমবার। শিবরাত্রির দিন এখানে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। ছোটো গ্রাম চেহারা নেয় বড় মাল্টিকমপ্লেক্স শহরের।

বিশ্বাসের পূজা। এইভাবেই হয় শিবের পুজো।

১৯০২ সালে নির্মিত হয় এই মন্দির। ত্বকের রোগ নিবারণে ভক্তি আর বিশ্বাসের জোরেই গড়ে উঠে মন্দির। সেদিন থেকে সেই বিশ্বাস ও ভক্তি এখনও অক্ষুন্ন। সম্মার্জনী দিয়ে পূজার চলটা এখানকার পরম্পরায় পরিণত। শুধুমাত্র পাশের গ্রাম নয়, শত ক্রোশ দূর থেকেও সব শ্রেণীর মানুষ আসেন পূজা দিতে। তবে পূজার মূল উপাচার সম্মার্জনী।

জঙ্গি হিযবুত তওহিদ প্রকাশ্যেই তৎপরতা চালাচ্ছে

ফিরোজ মান্না।। জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তওহিদ এখনও প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাচ্ছে। কালো তালিকাভুক্ত এই জঙ্গি সংগঠনের রয়েছে কয়েক হাজার প্রশিক্ষিত নারী বাহিনী। সংগঠনের প্রচার এবং প্রসার ঘটাতে বিলি করছে নানারকম প্রচারপত্র ও সংগঠনের শীর্ষনেতা মহম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা বিভিন্ন বই। সংগঠনে কর্মী ভিড়াতে তারা নানাভাবে প্রলুব্ধ করছে ধর্মপ্রাণ সরল মানুষদের। দেশের বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে তাদের গোপন প্রশিক্ষণ ঘাঁটি। এই জঙ্গি সংগঠনের আক্রমণে সারাদেশে কম করে হলেও ১৫ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। অথচ এই সংগঠনটি সম্প্রতি কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে দাবি করেছে তারা কোনও জঙ্গি ও নিষিদ্ধ সংগঠন নয়। তাদের প্রচারপত্র বিলিতে কোনও বাধা নেই।

সূত্রটি জানিয়েছে, সংগঠনটির জন্ম টাঙ্গাইলের করটিয়ায়। ১৯৯১ সালে করটিয়ায় জমিদার পরিবারের সদস্য মহম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হিযবুত তওহিদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই সংগঠনের ইমাম। ধীরে ধীরে এই সংগঠনটির কাজ সারাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে এই জঙ্গি সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কয়েক লাখ। সংগঠনের কার্যক্রম দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। ঢাকা ও বরিশালে 'হেদায়াতের পথ।' নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রামে 'মুত্তাকির পথ' নামে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। সংগঠনের পদ বিন্যাসে শীর্ষনেতা হচ্ছে 'ইমাম'। এর পরের স্থানে রয়েছে 'আমির', শেষ ধাপ হচ্ছে 'মুজাহিদ'। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ২০০ জনের একটি কমিটি আছে। এই কমিটির নাম 'মুত্তাকি।' হিযবুত তওহিদের ইমাম বায়াজীদ খান পন্নীর পরের স্থানে রয়েছে গাজীপুরের একজন কলেজ অধ্যাপক ও বরিশালের এক মওলানা। বায়াজীদ খানের অবর্তমানে এরা দুজন পর্যায়ক্রমে সংগঠনের হাল ধরবেন। ১৪ বছর ধরে সংগঠনটি তাদের জঙ্গি তৎপরতা চালিয়ে আসছে। ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে জঙ্গিবাদে দীক্ষা দিয়ে সরলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিপথগামী করে তুলছে। এই কাজ করতে বিদেশ থেকে পাচ্ছে বিরাট অঙ্কের টাকা। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, হিযবুত তওহিদ জন্মলগ্নে একটি দেশে গোয়েন্দা সংস্থার আনুকূল্য পেয়েছে। পরে ওই গোয়েন্দা সংস্থার হাত ধরে তারা মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ থেকে জঙ্গি তৎপরতার জন্য পাচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এই সংগঠনের ইমামের এক মেয়ে মধ্যপ্রাচ্য 'এদারা এখদ্দামুল কুরআন' নামের একটি বিদেশি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তার মাধ্যমে ওই সংগঠন থেকে বিরাট অঙ্কের টাকা আসছে হিযবুত তওহিদে।

এই সংগঠন থেকে পদত্যাগকারী আমির সোহরাব হোসেন এর আগে কয়েকটি পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, হিযবুত তওহিদ একটি জঙ্গি সংগঠন। এই সংগঠনের সব কার্যক্রমই জঙ্গি তৎপরতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রতিটি কর্মীকে হাতুড়ি এবং গুলতি মারার প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে হিযবুত তওহিদের আক্রমণে ১৫ জনের বেশি মানুষ প্রাণ দিয়েছে। নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালির সোনাইমুড়ী, কুষ্টিয়ায়, বরিশালে তারা একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। সারাদেশে এই জঙ্গি সংগঠনের সাড়ে ৫ শ'র ওপরে নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন অস্ত্র, বিস্ফোরক, জেহাদী বইসহ জঙ্গি তৎপরতার নানা

উপাদান পেয়েছে পুলিশ। এরপর তারা বলতে চাইছে তারা জঙ্গি সংগঠন নয়। সরকার তাদের কালো তালিকাভুক্ত করলেও তাদের কার্যক্রম থেমে নেই। ঢাকায় এই সংগঠনের কয়েক হাজার কর্মী কাজ করে যাচ্ছে। পুরুষ কর্মী দিয়ে কাজ করাতে গিয়ে ইতিপূর্বে বেশ কয়েক জায়গায় পুলিশী বাধা পেতে হয়েছে। কিন্তু মহিলা কর্মী দিয়ে কাজ করাতে এ ধরনের বাধা এখনও আসেনি। এই সংগঠনের এক নেতা বলেন, আমাদের সংগঠনে পুরুষ ও নারী কর্মীর সংখ্যা প্রায় সমান। আমাদের ইমামও নারী পুরুষ সমান সমান রাখতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। ইমামের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়।

সংগঠনের কর্মপরিধি দেশের বিভিন্ন জেলায় রয়েছে। বিশেষ করে বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালিতে সংগঠনের কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। এসব জেলার বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা হিযবুত তওহিদের নিয়ন্ত্রণে চলছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজের অভাবী ছাত্র-ছাত্রীকে অর্থ ও বেহেস্তে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে সংগঠনে টানছে। তারা সংগঠনের জন্য অন্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বায়াজীদ খান পন্নী রচিত 'দাজ্জাল' নামের একটি বই ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় জঙ্গি সদস্যরা প্রকাশ্যে বিক্রি করছে। একই সঙ্গে তারা তওহিদের ডাক নামে প্রচারপত্র বিলি করছে। সরকার সংগঠনটিকে কালো তালিকায় রেখেও তাদের কার্যক্রমের কোনও বিঘ্ন ঘটাতে পারছে না। আগেও হিযবুত তওহিদ যেভাবে প্রকাশ্যে তাদের কার্যক্রম চালাত এখনও তাই করে যাচ্ছে।

সূত্র জানিয়েছে, সংগঠনটির জন্মলগ্নে করটিয়া রোকেয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মওলানা ইব্রাহিম স্থানীয় পীর বজলুলকারী এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯৯২ সালে বায়াজীদ খান পন্নীর সঙ্গে তাদের বিবিধ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে তার সংগঠন থেকে বের হয়ে যায়। এরপর থেকেই বায়াজীদ খান পন্নীর নিজ বাড়িতে গড়ে তোলে কর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এরপর তার বিরুদ্ধে অন্যান্য ইসলামিক সংগঠন আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রবল আন্দোলনের মুখে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। বায়াজীদ খান পন্নী তার বাড়িতে দিনের বেলায় তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করতেন এবং রাতের বেলা জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিতেন।

একটি জঙ্গি সংগঠন হিসেবে আজ থেকে ১৪ বছর আগে টাঙ্গাইলের করটিয়ায় হিযবুত প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সংগঠনটি জন্মলগ্ন থেকেই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। প্রচলিত ইসলামকে সংগঠনটি মানে না। সংগঠনের ইমাম বায়াজীদ খান পন্নীর মতে যে ইসলাম সেই ইসলাম কায়েম করার জন্য তারা বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ভাঙতে জেহাদ করছে। এসব কর্মকাণ্ডের কারণে সংগঠনটির নেতাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছিল। তার বাড়ি স্থানীয় মানুষ আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। জনসাধারণের রোষ কমাতে পুলিশ করটিয়ায় বায়াজীদ খানের বাড়ির এলাকায় বেশ কয়েক দিন ১৪৪ ধারা জারি করে। পরে সরকার বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' নামের বইটি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ইসলাম বিরোধী প্রচার ও কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে এলাকার মানুষ তার ফাঁসি দাবি করলে পুলিশ তাকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জেলে পাঠায়। জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য বায়াজীদ খান পন্নীকে একাধিকবার জেল খাটতে হয়েছে।

উপত্যকায় কাশ্মীরি পণ্ডিতরা প্রবঞ্চনার শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আবারও কাশ্মীরি পণ্ডিতরা প্রবঞ্চনার শিকার। সম্প্রতি এক নেপালি বে-আইনিভাবে পণ্ডিতদের সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে। জনৈক এক মুসলিম আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তার কাছ থেকে জায়গাটি কিনে নিয়েছে। ওই জায়গার ওপর মন্দির নির্মাণের কাঠামোও ছিল। আইন অনুযায়ী কাশ্মীরে পণ্ডিতদের জায়গা তাদের নিজেদেরই। আইনত কেউই সেই জায়গা বিক্রি করতে পারে না। নেপালি ও ওই মুসলিম দুজনেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কাশ্মীর পণ্ডিত সংঘর্ষ সমিতির আইনি উপদেষ্টা ঘটনার বিশদ বিবরণ জানিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল এন এন ভোরাকে চিঠি পাঠিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮৯-৯০-এর মুসলিম জেহাদে কাশ্মীর উপত্যকায় সব থেকে বেশি অত্যাচারের শিকার হয় হিন্দুরাই। বিশেষ করে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর চরম অত্যাচার চালায় জেহাদি-গোষ্ঠী।

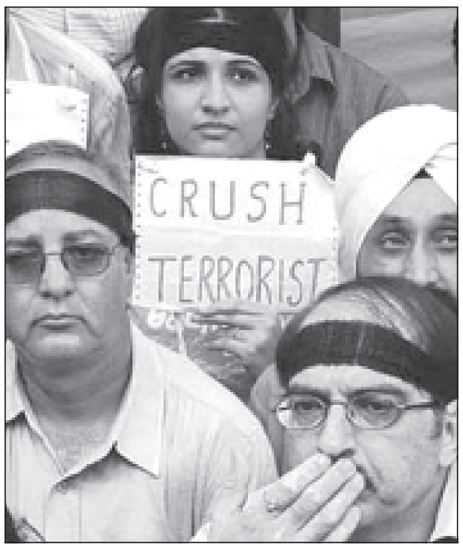

সরকারের ভূমিকা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। তবুও কাশ্মীরি পণ্ডিতরা দাঁত কামড়ে সব অত্যাচার সহ্য করেছেন। অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া পণ্ডিতরাও পরে এখানে ফিরে আসেন। এই জায়গা এখনও যথেষ্ট প্রতিকূল পণ্ডিতদের কাছে। এটা মুসলিম জেহাদিদের অন্যতম লক্ষ্যস্থল। সাম্প্রতিক এই ঘটনায় কাশ্মীরি পণ্ডিতরাও রীতিমতো বিস্মিত হয়েছেন। তাদের ক্ষেত্রে এইরককম ঘটনা যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজ্যপালকে লেখা চিঠিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, এলাকায় অনেকেই কায়েমী স্বার্থ পূরণের জন্য এখানে ঘোরাফেরা করছেন। ধর্মদাস মন্দিরের জমি জায়গাসহ অন্যান্য নথিপত্র সব বিক্রি করে দিয়েছে ওই নেপালি ব্যক্তি। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাছে এই মন্দির দ্বিতীয় রাম জন্মভূমি। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা আইনত তাদের সম্পত্তি উদ্ধার করতে প্রস্তুত বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

অসমে অকর্মণ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অসমে মুখ্যমন্ত্রীই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী। এখন একটি স্পর্শকাতর মামলায় মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর নিজেরই কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রায় দুমাস আগে দুজন বিধায়ক কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্যে অনধিকার প্রবেশ করে মৎস্যশিকার করে ভুরিভোজ সারেন। উপরন্তু বনবাংলোর কর্মীদের সঙ্গে অশোভন আচরণ এবং কটূক্তিও করেন এবং উচ্চপদস্থ বনাধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছবার আগেই তারা পালিয়ে যান। তাদের ঠিকানা দিসপুরের এমএলএ হোস্টেল। এখন তাদের নামে অভিযোগ দায়ের ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়ে আছে। পুলিশ তাদের টিকি ছুঁতে পারছে না। অথচ তারা গুয়াহাটি হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন, নিয়মিতভাবে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারও দিচ্ছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ওই বিধায়করা সমাজের মূলস্রোতে ফেরা প্রাক্তন আলফা জঙ্গি। দেখা যাচ্ছে যে, তাদের জঙ্গিপনা কমেনি অথচ জুটেছে শাসক দলের ছত্রছায়া।

পাকিস্তানে কার্যত এখন গৃহযুদ্ধ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অগ্নিগর্ভ পাকিস্তান। অগ্নিগর্ভ করাচী। গত ৩০ এপ্রিল বন্দুকের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে ৩৪ জনের। বন্দর শহর করাচী পাকিস্তানের মধ্যে সর্ববৃহৎ শহর। বাণিজ্যকেন্দ্র। একদা সযত্নে লালিতপালিত তালিবানরাই এখন পাকিস্তান সরকারের চরম বিরোধী। তালিবানী নেতা বায়াতুল্লা মাসুদ ও তার দলবল ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারিকে দিয়ে সোয়াত প্রদেশে শরিয়তী আইন বিধিবৎ চালু করিয়ে ছেড়েছে। ফলে তালিবানদের সাহস বেড়েছে। এখন তারা চাইছে পুরো পাকিস্তানকেই তাদের কবজায় নিতে। পাক নিরাপত্তা বাহিনী সোয়াতে অচল।

ওদিকে পাকিস্তানকে সবরকম সাহায্য দিয়ে এতদিন মজা দেখছিল আমেরিকা। পাকিস্তানী জঙ্গি-জেহাদিদের ভারতে দাপিয়ে বেড়ানো, অন্তর্ঘাত, বিস্ফোরণ, শয়ে-শয়ে, হাজারে-হাজারে নিরপরাধ মানুষ হত্যায় আমেরিকা কখনও বিচলিত হয়নি। ভারতের অভিযোগে কান দেয়নি রেগন, ক্লিনটন, বুশ----কেউই। এখন আমেরিকার নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বারাক হুসেন ওবামা। ওবামা এখন পাকিস্তানকে চাপ দিচ্ছেন তালিবানীদের দমন করতে। ফলে যে পাক সামরিক বাহিনী একদা মোল্লা-মৌলবী-তালিবানী-জেহাদিদের প্রতি স্নেহান্ধ ছিল এখন সেই সেনাবাহিনীকেই তালিবান দমনে নামাতে হয়েছে। পাক রাষ্ট্রপতি জারদারি দেশবাসীর কাছে সমর্থন ভিক্ষা করছেন। আমেরিকান রাষ্ট্রপতি বারাক হুসেন ওবামা পাকিস্তানকে মাত্র দু-সপ্তাহের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এর মধ্যেই তালিবানীদের দমন করতে হবে।

বছরের পর বছর আমেরিকা পাকিস্তানকে কোটি-কোটি ডলার আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। পাকিস্তানী শাসকরা তা নিজেদের মতো করেই ব্যবহার করেছে। হুসেন ওবামা এখন হিসাব চাইছেন। ফাঁপরে পড়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়েই ওবামার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তিনি পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল, ভঙ্গুর, নড়বড়ে দেশ বলে মন্তব্য করেছেন। তবে ওবামার বিশ্বাস তালিবানদের হাতে পাকিস্তানী পরমাণু বোমা এখনও পৌঁছায়নি। এদিকে 'ফকস্ নিউজ' সূত্রে খবর, আমেরিকার শীর্ষ সেনা কমান্ডার ডেভিড পেত্রাস খোলাখুলি বলেছেন, পাকিস্তান দু-সপ্তাহের মধ্যে তালিবানীদের ঘাঁটি সম্পূর্ণভাবে ধবংস না করলে ওয়াশিংটন নিজেই পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করবে। এখানে বলা দরকার যে, আফগানিস্তানে অবস্থানরত আমেরিকার সেনাবাহিনী মাঝে-মাঝেই পাকিস্তানে ঢুকে যন্ত্রচালিত বিমানের মাধ্যমে অথবা দ্রোণ ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে নিয়মিতভাবে পাক-তালিবানদের মেরে চলেছে। দ্রোণের আঘাতে অনেক নিরীহ পাকিস্তানবাসীও মারা পড়েছে।

প্রতিবেশী দেশ

আবার পেত্রাস সাহেবের মতে, আগামী দু-সপ্তাহ (১-১৪মে) পরিস্থিতি খুব জটিল হবে। ওই সয়মসীমার মধ্যেই স্থির হবে পাক সরকারের টিঁকে থাকার প্রশ্নটাও। পাকিস্তানের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলো দীর্ঘদিন থেকেই আল কায়দা এবং আফগান সন্ত্রাসবাদীদের কাছে স্বর্গতুল্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ইরান, কিউবা, সিরিয়া ও সুদান থেকে নিয়মিত অর্থের যোগান আসছে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে। তবে ইরানের তৎপরতাই বেশি। এই খবরও দিয়েছে আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

সোয়াত প্রদেশ এখন তালিবানীদের কব্জায়।

সম্প্রতি করাচীতে পরস্পর গুলি-গোলা চলার মূলে রয়েছে জাতিগোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব। পাখতুন জনজাতিরাই পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চল বলে কথিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের ভাষাও উর্দু নয়। আর ভারত থেকে যাওয়া মুসলমানদের ভাষা উর্দু। এই উর্দুভাষীরা আবার নিজেদের জন্য একটি আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন করেছে---মুত্তাহিদা কৌমি মুভমেন্ট বা সংক্ষেপে এম কিউ এম। পাখতুন জনজাতির তালিবানীদের ওপর এম কিউ এম খুব খাপ্পা। তালিবানীরা যে করাচীতেও বিপদের কারণ তা খোলাখুলিই বলছে এম কিউ এম। ফলে দুই গোষ্ঠীতে ঝামেলা লেগেই আছে। গত ২৯ এপ্রিল বাণিজ্যিক শহর করাচীতে দুজন এম কিউ এম ক্যাডারকে গুলি করে হত্যা করে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। তখনই রাস্তাঘাটে তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। গভীর রাত পর্যন্ত তাণ্ডব চলতে থাকে। পরদিন রাস্তায় নামানো হয় পাক-আধাসামরিক বাহিনীর রেঞ্জারদের। হাসপাতাল, ডাক্তার এবং পুলিশসূত্রে জানা গেছে একদিনেই ৩৪জন নিহত এবং অন্য ৫০ জন আহত হয়েছে। নিহতদের শবযাত্রা বের হতে করাচী শহর আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাজনীতিবিদরা শহরে শান্তিভঙ্গের জন্য মাফিয়া ও অপরাধীদের ওপর দোষ চাপান। এদিকে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের রাস্তায় বের হয়ে অপরাধীদের সামূহিক মোকাবিলার আহ্বান জানান লন্ডনে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে থাকা এম কিউ এম নেতা আলতাফ হুসেন।

রেঞ্জাররা সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে একদিনেই পঁচিশজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। একথা জানিয়েছেন রেঞ্জারদের এক মুখপাত্র মেজর আওরঙ্গজেব। তিনি আরও বলেছেন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনী এসময়ে পাশের বুনের জেলাতে তালিবান দমন অভিযানে নেমেছে আমেরিকার ঠেলায় আর জারদারির রাজত্ব বাঁচানোর তাগিদে।

সেনাসূত্রে জানা গিয়েছে, বুনের জেলার সদর শহর সেনাবাহিনী পুনরায় তাদের নিয়ন্ত্রণে এনেছে, মারা গিয়েছে ৫০ জনের বেশি তালিবান। তালিবানী সন্ত্রাসবাদীরা অনেক জওয়ান ও পুলিশকে পণবন্দী করে রেখেছে। সাধারণ মানুষকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। অনেক সাধারণ মানুষ শহর ছেড়ে পালাচ্ছে।

সেনাদের কভার করছে জেট ফাইটার বিমান এবং গানশিপ হেলিক্যাপ্টার। সেনারা আমবেলা, পীরবাবা এবং অন্যান্য এলাকার দিকে এগোচ্ছে। তবে তালিবানীরা প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে। রাষ্ট্রপতি জারদারি তালিবানদের বিরুদ্ধে সব পাকিস্তানীদের একত্রিত হওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন বারবার। লাহোর, পেশোয়ার, এমনকী রাজধানী ইসলামাবাদে তালিবানরা স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের বোরখা পরার ফতোয়া দিয়েছে। বলেছে, বাড়ির আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শিক্ষিকা ও ছাত্রীদেরকে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছে তালিবানরা। পুরুষদের টুপি পরার ফতোয়াও জারি হয়েছে।

সব মিলিয়ে পাকিস্তানে মুসলমানরা দ্বিধাবিভক্ত। একদল সম্পূর্ণ তালিবান ও শরিয়তপন্থী এবং অন্যরা একটু কম। একদা আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়া আফগানরাও বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে আফগানিস্তানের দিকে রওনা দিচ্ছে। আর সামান্য হাতে গোনা হিন্দু-শিখরা ভারতীয় পাঞ্জাবে পালিয়ে আসছে। এককথায় পাকিস্তানে প্রায় গৃহযুদ্ধের পরিবেশ। অনেক এলাকাতেই কেন্দ্রীয় শাসনের অস্তিত্বই নেই। তবে এই মে মাসের মধ্যেই একটা এসপার-ওসপার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

পাকিস্তানে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হিন্দুরা বিপন্ন বোধ করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স) তালিবানীদের অত্যাচার হিন্দুদের কাছে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। ওই অঞ্চলে বাসবাসকারী হিন্দু ও শিখেরা নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন। বর্তমানে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে উত্তপ্ত। যুদ্ধের ফলে সবদিক থেকেই উদ্বিগ্ন রয়েছেন হিন্দুরা। প্রাণভয়ে দিন কাটাচ্ছেন তারা। অনেকেই প্রাণ বাঁচাতে ভারতে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৫০টি শিখ ও হিন্দু পরিবার পাঞ্জাবে এসে আশ্রয় নিয়েছে। হিন্দু পরিবারগুলি হাসান আবদাল, রাওল-পিণ্ডির বুনের, সোয়াত ও অরখাজি এলাকা থেকে এসে পাঞ্জাবের গুরুদ্বারাগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে। 'এভাকিউ ট্রাস্ট প্রোপার্টি বোর্ড' (Evacuee Trust Property Board) আশ্রয় নেওয়া হিন্দু পরিবারগুলির দেখাশুনা করছে। বোর্ডই তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে বলে জানিয়েছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান আশিফ হাশমি। পাঞ্জাবের পাঁচটি মুখ্য গুরুদ্বারে তারা নিরাপদে রয়েছে। তিনি নিজে সমস্ত বিষয়টি তত্ত্বাবধান করছেন বলেও হাশমি জানান। গত সপ্তাহ থেকেই পাকিস্তানের হিন্দু পরিবারগুলি আসতে শুরু করেছে।

তালিবানীদের হাতে নির্যাতীত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু পরিবার।

তবে তালিবান সন্ত্রাসের মুখ থেকে সরে আসতে শিখদের বহু ঝক্কি পোহাতে হয়েছে। তালিবান জেহাদিদের জিজিয়া কর দিয়ে, তবেই তারা এদেশে আসতে পেরেছে। পাকিস্তান থেকে আসা সর্দার সুরাঙ (Surang) সিং বলেন, 'আমার বুনের শহর (পাকিস্তান) তালিবানদের প্রবেশের আগে পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ছিল। কোনও জিজিয়া কর দিতে হয়নি। কিন্তু তালিবানীদের আসার ফলে তা আর বেশিদিন বাদ থাকেনি।

এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের কোনও সক্রিয় পদক্ষেপ নজরে আসেনি। হিন্দুরা এখনও সেখানে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

ইতিহাসে উপেক্ষিত

বিস্মৃত হিন্দু নায়ক হিমু

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী

সুলতানী যুগে আফগান শাসনের শেষ লগ্নে যে হিন্দু সেনাপতির নেতৃত্বে দিল্লীর শাসন পরিচালিত হতো তার নাম হিমু বা হেমচন্দ্র। অমন সাহসী বীর যোদ্ধা, রণকুশল সেনাপতি, ধুরন্ধর তীক্ষ্ণধী কূটনীতিক দিল্লীর সিংহাসন দখল করেও বেশিদিন টিকতে পারেননি। ভাগ্য বিড়ম্বিত এই হিন্দু নায়ক সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে সুবিচার পাননি। তাই ইতিহাসের পাতায় তার কৃতিত্বের কোনও বিবরণ নেই। তার সমস্ত দক্ষতা, সমরকুশলতা, বীরত্ব নেতৃত্ব সবই আজ দেশবাসীর কাছে বিস্মরণের সমাধিতে ঢাকা পড়ে আছে। জন্মসূত্র ও ভাগ্য কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য না পেয়েও শুধু মাত্র নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভাবলে হেমচন্দ্র অতি সাধারণ এক সবজী বিক্রেতা থেকে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে মুসলমান শাসকদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও দিল্লীর তখতে বসতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই অসম্ভবকে সম্ভব করাই ছিল তাঁর আসল কৃতিত্ব। সমগ্র সুলতানি যুগ ও মোঘল যুগে ১১৯২ খৃস্টাব্দের পর ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আর কোনও হিন্দু এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি।

আলোয়ারের দক্ষিণাঞ্চলে বেনিয়া সম্প্রদায়ের ধনবান গোষ্ঠীর এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ঐতিহাসিক বারণীর মতে তিনি মেওয়ারের রেওয়ারী শহরে সবজী বিক্রি করতেন। দিল্লীর সুলতান ইসলাম শাহ (১৫৪৫-১৫৫৪) রেওয়ারীর শাসনকর্তা থাকাকালীন হিমুকে আবিস্কার করেন। এই ইসলাম শাহের পূর্ব নাম ছিল জালাল খাঁ। তিনি শের শাহের দ্বিতীয় পুত্র। ১৫৪৫ খৃস্টাব্দে শের শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর ওমরাহগণ তাঁকেই সুলতান পদে মনোনীত করেন। সিংহাসন আরোহণের পর তিনি ইসলাম শাহ নাম গ্রহণ করেন। ইসলাম শাহ ক্রমে হিমুকে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে উন্নীত করেন। হিমুর চেহারা ও যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে ইসলাম শাহ তাঁকে ধীরে-ধীরে একজন বিশ্বস্ত ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আমলায় পরিণত করেন। হিমুকে প্রথমে দিল্লীর বাজারের নিয়ন্ত্রকের পদে (সাহ্‌না) নিযুক্ত করা হয়। কিছুদিন পরে তাঁকে গুপ্তচর বিভাগ ও ডাক বিভাগের শীর্ষ পদে (দারোগা-ই-ডাকচৌকি) বসানো হয়। সামরিক দায়িত্ব সহ গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিষয়াদি দেখাশুনার দায়িত্ব তিনি এই বিশ্বস্ত হিন্দু ওমরাহের ওপর ন্যস্ত করতেন।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর আদিল শাহ দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি হিমুর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে তার প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। ফলে দিল্লী সাম্রাজ্য পরিচালনার পুরো দায়িত্বটাই হিমুর ওপর বর্তায়। আদিল শাহের শাসনকালটা খুব সুখের ছিল না। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিষম গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাকে হত্যা করে মুকারিজ খাঁ ক্ষমতা দখল করে আদিল শাহ নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর নেতৃত্ব অবিসংবাদিত ছিল না। আগ্রায় শাসনকর্তা ইব্রাহিম খাঁ শুর, লাহোরের শাসনকর্তা সেকেন্দার শুর ও বাংলার শাসনকর্তা মোহাম্মদ খাঁ শুর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দিল্লীর সিংহাসনের দাবীদার হন। এ ছাড়াও আদিল শাহকে আরও নিত্য নতুন বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। তার রাজত্বের এই দুঃসময়ে স্বজাতি আফগান বা তুর্কি ওমরাহদের মধ্য থেকে কাউকে না নিয়ে আদিল শাহ একজন হিন্দু হিমুকে শাসন ক্ষমতার উচ্চপদে বসান। এতেই হিমুর যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মেলে। যদিও আবুল ফজল ও বাদাউনির মতো মোগল ঘেঁষা ঐতিহাসিকগণ হিমুর যোগ্যতাকে কোনওদিন গুরুত্ব দেননি এবং তার চরিত্রকে নানাভাবে কালিমালিপ্ত করে গেছেন। কারণ আদিল শাহ নয়, হিমুই ছিলেন বৈরাম খাঁ ও নাবালক আকবরের প্রবলতম প্রতিপক্ষ। একমাত্র হিমুকে পরাজিত ও নিহত করেই বৈরাম খাঁ নাবালক আকবরকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাতে পেরেছিলেন।

সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার নিয়েই হিমুকে আদিল শাহের নানা বিরুদ্ধ শক্তির বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত হতে হয়। হিমুর বীরত্ব ও যুদ্ধ জয়ের কাহিনী সবটাই পাওয়া যায় আবলু ফজল ও বাদাউনির লেখা থেকে। যদিও তাদের কেউ-ই হিমুকে কখনও বরদাস্ত করতে পারেননি। তাঁকে সবসময় ঘৃণ্য ও নীচ বংশজাত একজন সুবিধাবাদী হিন্দু ভুঁইফোঁড় বলেই উল্লেখ করে গেছেন। তবুও তাদের এই বিরোধিতাপূর্ণ লেখা থেকেই হিমুর চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি বেরিয়ে এসেছে। যেমন আবুল ফজল লিখেছেন ঃ সুলতানীর দাবিদার ইব্রাহিমের সাথে হিমুর একাধিবার যুদ্ধ হয় এবং হিমু সব সময়ই বিজয়ী হন। সুলতান মহম্মদ বাংলায় নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেও হিমুর কাছে দিল্লী দখলের যুদ্ধে পরাজিত হন। হিমু তাজ কররাণি ও রুকণ

খাঁ লুঙ্গানির সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের পরাজিত করেন। তারা সকলেই আদিল শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ও দিল্লী দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু হিমুর পরাক্রমের কাছে পরাজিত হয়ে উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হন। আদিল শাহের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে হিমু ২২ বার যুদ্ধ করেন এবং সব কয়টিতেই জয়লাভ করেন।[১]

ঐতিহাসিক বাদাউনি আরও বিস্তৃতভাবে এই যুদ্ধের বিবরণ রেখে গেছেন। তাজ খান যখন আরও দুজন নেতৃস্থানীয় প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যে আদিল শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তখন হিমু তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাদের সম্মিলিত বাহিনীকে বিধবস্ত করে দেন।

দিল্লীর তখতের দাবিদার, আদিল শাহের আর একজন ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্রাহিম শূরের সঙ্গেও হিমুকে কঠিন সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। বাদাউনি বলেন, ‘হিমু ইব্রাহিমকে তার বিশেষ শিকার মনে করে তাকে উৎখাত করতে কৃত সংকল্প হন, ফলে ইব্রাহিম ও হিমুকে অপসারণের জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ঈশ্বরের নির্দেশে তিনি পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে ইব্রাহিম খাঁ দ্রুত কলপি ত্যাগ করে বায়নাতে পলায়ন করেন। হিমুও দ্রুত তার পশ্চাৎ ধাবন করে বায়নাতে পৌঁছান। ইব্রাহিম বায়নায় বসবাসকারী আফগান চাষী ও ভূস্বামীদের দলবদ্ধ করে এক রাতে হিমুর শিবির আক্রমণ করেন এবং পরদিন সকালে বায়নার দশ ক্রোশ দূরে খানওয়াহ শহরে হিমুর সাথে তীব্র যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু এবারও তার ভাগ্য জয়যুক্ত হল না।[২] যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইব্রাহিম খাঁ বায়নার সুউচ্চ ও দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নেন। হিমু তিন মাস যাবৎ ওই দুর্গটি অবরোধ করে রাখেন ও বায়নার চতুর্দিকে লুণ্ঠন করে সব ধবংস করে দেন। এই সময় হিমুর কাছে খবর আসে যে বাংলার শাসনকর্তা মহম্মদ খাঁ শূর সুলতান জালালুদ্দিন উপাধি গ্রহণ করে প্রচুর সৈন্য-সামন্ত সহ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয়ে জৌনপুর দখল করে কলপি ও আগ্রার দিকে ধেয়ে আসছেন। ইতিমধ্যে সম্রাট আদিল শাহ হিমুকে বার্তা পাঠালেন। “এক্ষুনি যেমন করেই হোক আমার কাছে চলে এসো। আমি এক শক্তিশালী শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত।” এই অবস্থায় হিমু দুর্গের অবরোধ তুলে নিয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিছুদূর অগ্রসর হলে ইব্রাহিম খাঁ পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করে পরাজিত হন। এর কিছু পরে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে ইব্রাহিম খাঁ পুনরায় হিমুকে আক্রমণ করেন এবং আবারও পরাজিত হন। এরপর তিনি হিমুর সাথে আবার যুদ্ধ করেন। হিমু দ্রুত তাঁর প্রভু সম্রাট আদিল শাহের কাছে পৌঁছান। আদিল শাহের সৈন্যরা তখন বাংলার বিদ্রোহী শাসনকর্তা মহম্মদ খানের সৈন্যদের মুখোমুখি হচ্ছে। বাদাউনি এই যুদ্ধের বিবরণ এই ভাবে দিয়েছেন, “মহম্মদ খাঁ তার সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠত্ব ও সংখ্যাধিক্যের ওপর নিশ্চিত ভাবে নির্ভর করে আদিল শাহের সৈন্যদের মোকাবিলা করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করলেন। তিনি অসংখ্য অশ্বারোহী, পদাতিক ও হস্তীবাহিনী সন্নিবেশ করে বিজয় প্রত্যাশা করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তার জয়ের প্রত্যাশা হতাশায় পরিণত হয়। হিমু ধূমকেতুর মতো তার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন; যমুনা নদী পার হয়ে হিমু অতর্কিতে মহম্মদ খানের সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী বাহিনী ধবংস করে দেন। মহম্মদ খানের বেশির ভাগ সেনাপতি আমির ওমরাহ নিহত হয় ও বাকিরা পলায়ন করে। মহম্মদ খান চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যান।[৪]

এই বিদ্রোহ দমনের পরে পরেই হুমায়ুন তার হৃত সাম্রাজ্য পুনর্দখলের জন্য ভারতে ফিরে এলেন। আদিল শাহ নিজে বিহারের চুনার দুর্গে অবসর যাপনের জন্য থেকে গেলেন এবং হিমুকে উত্তরে পাঠালেন হুমায়ুনকে প্রতিহত করার জন্য। হুমায়ুন কয়েক মাসের জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বটে কিন্তু ১৫৫৬ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নিজের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে দুর্ঘটনায় মারা যান। আদিল শাহের পক্ষে হিমু রয়ে গেলেন বালক আকবরকে ঠেকানোর জন্য। হুমায়ুনের মৃত্যুর সাথে সাথে কালানৌরে আকবরকে ‘বাদশাহ’ হিসেবে ঘোষণা করা হল এবং তার্দি বেগকে দিল্লীর গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। হিমু বিহার থেকে গোয়ালিয়র হয়ে আগ্রা পৌঁছান ও মোগল বাহিনীকে এক যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি ১৬০টি হাতি, একহাজার আরবী ঘোড়া ও প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করেন। এর ফলে দিল্লী ও আগ্রা তাঁর অধিকারে আসে। এই জয়ের পর হিমুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায় এবং হিন্দুস্থানের সার্বভৌম ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। হিমুর কট্টর বিরোধী মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজল লেখেন, “পরপর যুদ্ধ জয়ে হিমুর মনে অশুভ চিন্তার উদয় হয় এবং দিল্লী দখলের পর তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রমত্তমা পাগলামীতে পরিণত হয়।” অন্যান্য সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিকরাও হিমুর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে অনৈতিক ও অন্যায় বলে নিন্দা করেছেন। একমাত্র ভিনসেন্ট স্মিথই কিছুটা সহানুভূতির সুরে লিখেছেন, “হিমু তার প্রভু আদিল শাহের নামে দিল্লী ও আগ্রা দখল করে অনেক হস্তী ও শক্তিশালী সেনা বাহিনীর মালিক হয়েছেন। এখন তাঁর অনুপস্থিত নিয়োগ কর্তার বদলে নিজেই রাজত্ব করার কথা চিন্তা করছেন।” হিমুর প্রকৃত ধারণা কি ছিল তা কেউ সঠিক জানত না। এখন তো কোনওক্রমেই জানা সম্ভব নয়। আর তৎকালে সাম্রাজ্য দখলের এমন চিন্তা বিজয়ী সেনাপতির থাকতেই পারে। এটা মোটেই দোষের ছিল না। কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ একজন সাধারণ হিন্দু সেনাপতির এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে গর্হিত বলেই বর্ণনা করে গেছেন। ভারতবর্ষে হিন্দু শাসন চালু করার একটা ইচ্ছা তাঁর থাকতেই পারে। কারণ এর কিছু পরেই তিনি দিল্লী দখল করে সহযোদ্ধা আফগান ওমরাহ ও সৈন্যদের প্রচুর অর্থ বিতরণ করে তাদের সমর্থন আদায় করে নেন। তাদের সম্মতি ও সমর্থনে তিনি দিল্লী দখল করে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে সিংহাসনে বসেন ও নিজের নামে মুদ্রা ছাপান। তিনি বিক্রমাদিত্য বা রাজা বিক্রমজিৎ উপাধি গ্রহণ করেন।* ১৫৫৬ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি দিল্লীর রাজা ছিলেন।

এদিকে আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ আকবরকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে পাঞ্জাবের দিপালপুর থেকে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। হিমুর সৈন্যবল মোগলদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ১৫৫৬ খৃস্টাব্দের ৫ নভেম্বর পানিপথের প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। ভিনসেন্ট স্মিথ সেই যুদ্ধের বিবরণ এইভাবে দিয়েছেন, “৫ নভেম্বর হিমু মোগল বাহিনীর ডান ও বাম পার্শ্বকে পর্যুদস্ত করে পূর্ণ বিজয়ের জন্য তার পর্বতের ন্যায় সেনাবাহিনীকে নিয়ে শত্রুপক্ষের কেন্দ্রীয় স্তরে সেনাপতি জামাল খাঁকে নিয়ে আঘাত হানতে উদ্যত, তখন শত্রুপক্ষের একটি তীর তার চোখ বিদ্ধ করে মস্তিষ্কে আঘাত করে। তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। তার এই অবস্থা দেখে তার সেনাবাহিনী প্রতিরোধের চেষ্টা না করে চতুর্দিকে পলায়ন করে।”[৬]

ভিনসেন্ট স্মিথ এই ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা (Accident) বলেছেন, যা হিমুকে সিংহাসন ও জীবন থেকে চিরতরে বঞ্চিত করে। তিনি মনে করেন, এই যুদ্ধে হিমু অবশ্যই বিজয়ী হতেন। Sir Welesley Haeg দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, “Moghul forces would certainly have been overpowered had not Himu's eye been piercae by an arrow.” অদৃশ্য ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে, যার বিজয়ী হওয়ার কথা তিনি পরাজিত হয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন। অজ্ঞান অবস্থায় হিমু ধৃত হলেন। ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছেন, “বৈরাম খাঁ তাকে হত্যা করে বালক আকবরকে গাজি বানাতে চেয়েছিলেন। তার নির্দেশে বালক আকবর তরবারির আঘাতে হিমুর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমিরগণও প্রত্যেকে রক্তঝরা হিমুর দেহের ওপর তরবারি চালায়। হিমুর মাথাকে কাবুলে পাঠানো হয় লোকদের দেখানোর জন্য এবং ধড়টা দিল্লীর একটি সিংহদুয়ারে ঝুলিয়ে রাখা হয়।”[৮] হিমুর বিয়োগান্তক পরিণতির এখানেই শেষ নয়। এরপর আকবরের সৈন্যরা আলোয়ার রাজ্য দখল করে নেয়। এখানেই ছিল হিমুর পৈতৃক বাড়ি। একজন মোগল সেনাপতি

(এরপর ৯ পাতায়)

হিন্দু নববর্ষে নব-ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইল থাইল্যাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। হিন্দু নববর্ষ পালনের মধ্য দিয়ে নব-ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইল থাইল্যান্ড। হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতৃত্বে গত ৩ এপ্রিল ব্যাঙ্ককের ঝাঁ চক্ চকে শহরে পালিত হল হিন্দু নববর্ষ। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ একই ছাতারতলায় উপলব্ধি করলেন নববর্ষের বৈদিক মাহাত্ম্য ও গুরুত্বর কথা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিল্লীর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর নির্দেশক তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক তরুণ বিজয়, থাইল্যান্ডের হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্ঘচালক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের থাইল্যান্ড শাখার সভাপতি চিন্তামণি ত্রিপাঠি। প্রসিদ্ধ 'দেব' মন্দিরের সভাপতি অশোক বাজাজ ছিলেন অনুষ্ঠানের বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি। এই সঙ্গে স্থানীয় হিন্দু সংগঠনগুলির কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও এদিন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দূতাবাসের সাংস্কৃতিক দপ্তরের সম্পাদক সুবীর দত্ত-ও।

গৌরিক ধবজের উত্তোলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজনীয় ডাক্তারজী, দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী ও থাই রাজা ভূমিবল অতুল্যতেজ-এর প্রতিমূর্তিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এখানে হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ হিসাবে পরিচিত। উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানান তরুণ বিজয়।

শ্রীবিজয় তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত অতিথিদের সামনে হিন্দু নববর্ষের তাৎপর্যের কথা সহজ-সরল ভাষায় পরিবেশন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বুদ্ধি র প্রখরতা, বাস্তববোধ ও সহজ-সরল আচরণের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে হিন্দুরা সমাদৃত। বিশ্বের মধ্যে একমাত্র হিন্দুরাই সমভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী। তিনি সমস্ত হিন্দু সংগঠনগুলিকে ভেদাভেদ ও সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দু সমাজের ওপর ঘাত-প্রতিঘাতের প্রসঙ্গও তিনি সেইসঙ্গে আলোচনা করেন। এই দিনের অনুষ্ঠানে তিনি থাইল্যান্ড রাজা ভূমিবল অতুল্যতেজ-এর প্রশংসা করেন— সমগ্র বিশ্বের কাছে হিন্দুত্বের নিদর্শন তুলে ধরার জন্য। ব্যাঙ্কক-এর আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের নাম তিনিই সুবর্ণভূমি রাখেন। যা ছিল এদেশের প্রাচীন নাম। সংস্কৃত থেকে আসা শব্দ। থাইল্যান্ডের শুধু এয়ারপোর্টের নয়, সেই সঙ্গে থাইবাসীদের জানা রয়েছে সাগর মন্থন, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাহিনীও। থাইবাসীদের ভগবান গণেশের পুজো, বিশ্ব-সভ্যতার ক্ষেত্রে শুভ লক্ষণ বলে বর্ণনা করলেন শ্রীবিজয়। তিনি সেদিন ৫৯ বছর বয়সী মোহনরাও ভাগবতের সরসঙ্ঘচালক রূপে দায়িত্ব গ্রহণের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। অনান্য বক্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বৌদ্ধি ক প্রমুখ দীনেশ মানি দুবে। এছাড়া অনান্য ব্যক্তিবর্গও তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

থাইল্যাণ্ডে র রাজধানী ব্যাঙ্ক কে পালিত হচ্ছে হিন্দু নববর্ষ।

গত ২৭ এপ্রিল কলকাতায় কল্যাণ ভবনে আয়োজিত 'সমস্যা অনেক, সমাধান এক— গোমাতা' শীর্ষক গ্রন্থটির উন্মোচন অনুষ্ঠানে ডান দিক থেকে রামগোপাল গুপ্তা, গজানন বাপট, স্বামীজী, অমিতাভ ঘোষ, রাণাপ্রতাপ রায় প্রমুখ।

বিস্মৃত হিন্দু নায়ক হিমু

(৮ পাতার পর)

হিমুর নিজের শহরে গিয়ে উপস্থিত হন। তারপরের ঘটনা আকবরের বিশ্বস্ত বন্ধু ও ঐতিহাসিক আবুল ফজলের ভাষায় ঃ "জায়গাটা ছিল বেশ শক্তিশালী এবং অনেক যুদ্ধে র পর হিমুর বাবাকে ধরে সেনাপতি নাদির-উল-মুলকের সামনে হাজির করা হল। নাদির-উল-মুলক তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি উত্তরে বলেন, "আশি বছর বয়সে আমি ধর্ম ত্যাগ করব কেন? অন্য ধর্মটা না বুঝে শুধু প্রাণের ভয়ে আমি ধর্ম ত্যাগ করব কেন? উপস্থিত পীর মহম্মদ তার এই কথা না শুনার ভান করে তরবারির ভাষায় এর উত্তর দেন।"[৯] হিমুর পৈতৃক বাড়িঘর ধবংস করে দেওয়া হয়। এই ছিল হতভাগ্য হিমুর পরিবারের করুণ পরিণতি।

এক অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে শুধুমাত্র নিজের যোগ্যতা ও সামরিক প্রতিভাবলে মুসলিম শাসনের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসনে বসার হিম্মত এই মহান হিন্দু নেতার ছিল। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা মধ্যযুগের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় তার সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহসিকরা তার প্রতি সুবিচার করেননি। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী এই বীর সেনাপতির কথা জানতে পারেনি।

তথ্যসূত্র ঃ-

১. Beveridge - op. cit, p.45.
২. Ranking. op. cit, p.548-I.
৩. Ibid. pp 552-3.
৪. Ibid. p 555.
* আফগানরা তাকে 'হিন্দুশাহ' বলে অভিহিত করত।
৫. Beveridge. op. cit, pp. 36-7.
৬. V.A.Smith. op. cit, pp. 36-7.
৭. CHI IV. p. 72.
৮. V.A. Smith. Op.Cit. p. 39.
৯. Beveridge. Op.Cit. pp. 71-2.

চিঠিপত্র

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ও সুপ্রীম কোর্ট

বাংলাদেশী তথা পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে অসমে আন্দোলন চলছে। শান্তিপূর্ণ সেই আন্দোলন সরকারী উদাসীনতায় এখন হিংসাশ্রয়ী রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি সারাভারত আইনজীবী ফোরাম এবং একটি এন জি'ওর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ নির্দেশ দিয়েছেন, বাংলাদেশীদের লাগাতার অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ওই নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ দেশের জনবিন্যাস জনবৈচিত্র্য এবং নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। ভারতে বাংলাদেশীদের গ্রহণ করতে হবে।

সুপ্রীম কোর্টের এই আদেশে ভারতপ্রেমী সব মানুষের মনে নূতন করে আশার আলো ফুটে উঠেছে। এরসঙ্গে আবার একটা সন্দেহের তীরও উঁকিঝুঁকি মারছে। কারণ, দীর্ঘস্থায়ী অসম আন্দোলন এখনও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোর ঘুম ভাঙাতে পারেনি। অনুপ্রবেশকারীদের তোষণনীতিই যেন ভারত সরকারের প্রধান নীতি। যে দেশে এমন সব সরকার সে দেশে সুপ্রীম কোর্টের এমন একটি আদেশ কি কার্যকর হতে পারে? আমাদের দেশের বিরোধী রাজনীতিক চরিত্রেও কি এমন কোনও বলিষ্ঠ সচেতনতা আছে যে----জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্টের এই আদেশকে দ্রুত কার্যকর করার জন্য গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে? এমনি নানারকম প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে দেশের সাধারণ মানুষ এখন বিভ্রান্ত। যাই হোক, এখন নূতন করে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের জন্য চলছে সারাদেশে নির্বাচনের ব্যস্ততা। ভোটাধিকার প্রয়োগের সময় সাধারণ মানুষের মনে হয়তো এই বিষয়টিও ঘুরেফিরে আসবে। কারণ সুপ্রীম কোর্ট মামলার রায় দিয়েছে নির্বাচনের প্রাক্‌মুহূর্তে। তবে ভোটাধিকার নাগরিকগণ যে দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রয়োগ করুক না কেন, দেশের জনবিন্যাস, জনবৈচিত্র্য এবং নিরাপত্তার স্বার্থে চাই জাতীয় রাজনীতির চরিত্র বদল। তা না হলে মুসলিম সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের কূট-কৌশলকে ঠেকানো যাবে না। তারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য অমুসলিম দেশগুলোতে অনুপ্রবেশে ইন্ধন জোগাবেই।

আমরা বর্তমানের ঘটনাবলী বাদ দিয়ে অতীতের দু-চার কথা বলি। অসমে যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন ফকরুদ্দিন আলি সাহেব, তখন অসমের মুসলমান সম্প্রদায়ের মতন পাকিস্তানেও আনন্দের প্লাবন আসে। সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ কথায়-কথায় বলতো "অসমে আইছে আলি পাকিস্তান কর খালি।" এ আওয়াজ তুলে তখন শুরু হয়েছিল ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশের ঘটনা, যা কেন্দ্রীয় সরকারকেও চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল।

এবার আমরা আসি স্বাধীনতার অনেক আগের একটি ঘটনায়। বৃটিশ জমানার শেষ প্রান্তে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন শেখ সহীদুল্লা। তখন তিনি পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের ঘনবসতি এলাকা থেকে ভূমিহীন কৃষকদের অসমের বিস্তীর্ণ এলাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। যার ফলে মুসলিম মহলে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত হয়। বাক্যটি ছিল---উপরে আল্লা নীচে সহিদুল্লা। সারা পৃথিবীকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার জন্য এই মধ্যযুগীয় কূট-কৌশলের এখনও বিরতি নেই। শুধু অসম বাংলা ত্রিপুরাই নয়, অরুণাচল, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সমানতালে এগিয়ে চলছে এই কর্মসূচী। জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক এই সব কর্মসূচীকে ঠেকাবার জন্যই সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুপ্রীম কোর্টের এই ঐতিহাসিক রায়কে বাস্তবায়িত করার মতন কি ভারতীয় মানসিকতা আছে? কারণ, কোনও অনুপ্রবেশকারীকেই বাংলাদেশ বা পাকিস্তান গ্রহণ করবে না। এদের বলপূর্বক বিতারিত করার মতনও ভারতীয় সাংবাধানিক পরিকাঠামো নেই। তা ছাড়া এটাকে একটা আন্তর্জাতিক সমস্যাও বলা যেতে পারে। অতএব অনুপ্রবেশজনিত সুপ্রীম কোর্টের রায় যে থাকবে আদালতের ফাইল বন্দি, একথা আরও বহু ঘটনার সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে বলা যায়। এটা আমাদের একটা জাতীয় দুর্ভাগ্য। এখন দেখা যাক, নূতন সরকার ফাইল বন্দি সুপ্রীম কোর্টের রায়কে কতটা মর্যাদা দিয়ে ভারতবাসীর আশা পূরণের সহায়ক হতে পারে।

--শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

নোংরা রাজনীতি

পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের ক্ষমতা হারানোর ভয়ে রাজ্যের সি পি এম নেতৃত্ব নানানভাবে নোংরা অবৈধ উপায় অবলম্বন করছে। তার সাম্প্রতিক উদাহরণ, তাপসী মালিক সংক্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত সি. ডি. প্রকাশ।

সিঙ্গুরের আন্দোলনরত কৃষক পরিবারের কন্যা তাপসী মালিকের হত্যাকাণ্ড নিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে অনেক তোলপাড় হয়েছে। পরবর্তীকালে যেটা হয়ে দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক ইস্যু। সেই পুরনো ইস্যুকে আবার নোংরাভাবে জাগিয়ে তুলে সি. পি. এম যে নিজেদেরই মুখে পোড়াল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নির্বাচনের প্রাক্কালে তাদের এই ভুল পদক্ষেপ দলের ক্ষতি করবে, তা আজ দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।

আসলে মানুষ কুৎসার 'আশ্রয়' তখনই নেয়, যখন তার আত্মপক্ষ সমর্থনে বিশেষ কিছু বলার থাকে না। বর্তমান সি.পি.এম নেতৃত্বের হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা। নিজেদের পক্ষে সাফাই গাওয়ার আর তাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট নেই। দীর্ঘ ৩২ বছরের বাম জমানার ধাপ্পাবাজি মানুষ ধরে ফেলেছে। তাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নেতারা এমন উলটো পালটা প্রলাপ বকছেন। মানুষকে অপমান করতেও তাদের বাধছে না।

ব্যক্তিগত চরিত্র হনন সি.পি.এমের পুরনো কালচার। অতীত দিনে অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেনদের চরিত্রহননের চেষ্টা তারা করেছেন। কিছুদিন আগে নিজেদের সহকর্মী সৎ সি.পি.এম নেতা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত নৃপেন চক্রবর্তী সম্পর্কে সি.পি. এম নেতারা বলেছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন, পাগল প্রতিপন্ন করার। মতে না মিললে এবং বিরোধীদের সম্পর্কে তারা যে কত নিষ্ঠুর এটি তার বড় নিদর্শন।

--সুশান্ত কুমার দে, গ্রিন পার্ক, কলকাতা-১০৩।

জমি জরু ও জান

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা---দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ যে দেশের শাসক এবং প্রজা উভয়েই মুসলিম, দ্বিতীয়ত দার-উল-আমন অর্থাৎ যে দেশের শাসক এবং বেশিরভাগ প্রজা মুসলিম এবং অমুসলিম প্রজারা সংখ্যালঘু, তৃতীয়ত দার -উল-হারাব অর্থাৎ যে দেশের শাসক ও বেশির ভাগ প্রজা অমুসলিম, এই দেশ হল শত্রুর দেশ। সমগ্র বিশ্বের দার-উল-হারবকে প্রথমে দার-উল-আমন এবং শেষে দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে যে কতকগুলি পথ মুসলিম উগ্রবাদীরা ব্যবহার করছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল এই অনুপ্রবেশ।

পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যায় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে সুপরিকল্পিতভাবে অনুপ্রবেশকারীরা তাদের শিকড় গেড়ে যাচ্ছে। বসিরহাট, বনগাঁ ও হাসনাবাদ সীমান্ত এবিষয়ে জ্বলন্ত প্রমাণ। একটা বিশেষ ক্রমান্বয়িক পদ্ধতি অনুপ্রবেশকারীরা অনুসরণ করছে।

সর্বপ্রথম, তারা প্রধানত ইঁটভাঁটার শ্রমিক হিসাবে দালালদের মাধ্যমে এদেশে ঢুকছে। এরপর বসিরহাটের চৌরা, সংগ্রামপুর, ইটিন্ডা এবং বাদুড়িয়ার লক্ষীনাথপুর ও হাসনাবাদ ও বনগাঁর অসংখ্য ভাঁটাতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে। ভাটা মালিকরা হয় মুসলিম, নয়তো অল্প খরচে শ্রমিক পাওয়ার লোভে তাদেরকে কাজ দিচ্ছে। এব্যাপারে পুলিশ প্রসাশন সব জেনেও চুপ। কারণ বহু অর্থ ঘুষ দিয়ে পুলিশকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে ওই অসাধু ব্যবসায়ীদের দল।

এরপর বর্ষাকালে ইঁটভাটার কাজকর্ম বন্ধ থাকার সময় ওই অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মুসলিমরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিভিন্ন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তির জমিতে, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বা বাড়িতে মজুরের কাজ নেয়। ধীরে-ধীরে কূটকৌশলে তাদের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে এবং মালিকের দয়া-দাক্ষিণ্যে স্বচ্ছল জীবনযাপন শুরু করে। এবার স্থানীয় কোনও মুসলিম পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় শ্বশুরকে বাবা সাজিয়ে রেশন কার্ড করে নেয়।

এবার এই অনুপ্রবেশকারীরা তাদের আসল খেলা শুরু করে। প্রথমে গরু চোরাচালান, চুরি-ডাকাতি এবং সোনার বিস্কুট পাচার করে অল্পদিনেই বেশ কিছু অর্থের মালিক হয়। এরপর শুরু করে নারী পাচার, মাদক দ্রব্যের চোরাচালান এবং জালনোটের কারবার। ভোটের সময় তারা তথাকথিত মেকী ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে পেশী ও অর্থবল দিয়ে সাহায্য করে প্রশাসনকে তাদের হাতের খেলনা করে তোলে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে বেশিরভাগ মুসলিম পুলিশ আধিকারিক নিয়ে আসা হয়। এইভাবে অতি অল্প সময়েই তারা এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হয়ে ওঠে।

এইসময় প্রায়ই তাদের বাড়িতে উৎকট চেহারার লম্বা গোঁফ, দাড়ি যুক্ত উর্দুভাষী মেহমানদের ঘন-ঘন আগমন হয়। মহল্লার মুসলিম যুবকদের নিয়ে তাদের বাড়িতে রাত্রিবেলা সমাবেশ হয়। সাথে সাথে ওই যুবকদের আচার আচরণ দ্রুত বদলাতে থাকে। এরপর ওই প্রভাবশালী অনুপ্রবেশকারী এবং স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপে ওই অঞ্চলে রাতারাতি কয়েকটি মসজিদ বা মাদ্রাসা গজিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এগুলিতে আশ্রয় নেয় সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিরা। প্রতিটি মসজিদ হয়ে ওঠে অস্ত্রাগার।

ইতিমধ্যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠা অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে আনা ছোট ছোট ছেলেগুলি যুবক হয়ে শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ যেতে শুরু করে। সেখানে তারা (রাজ, নীল, রাজু, আকাশ) প্রভৃতি হিন্দু নাম নেয়। তাদের উদ্দেশ্য হিন্দু মেয়েদের ভুলিয়ে বিয়ে করে মুসলিম বানানো অথবা পাচার করে দেওয়া।

এরপর ওরা লক্ষ্য দিচ্ছে হিন্দুদের জমি ও ব্যবসার দিকে। একটু-একটু করে হিন্দু পাড়ায় জমি কিনছে। সঙ্গে আরও মুসলিম এনে বসাচ্ছে। সংখ্যাবৃদ্ধির পর নানা উৎপাত শুরু করছে। মাতলামি, মহিলাদের শ্লীলতাহানি, চুরি-ডাকাতি থেকে শুরু করে ঘর-বাড়ি-মন্দির নোংরা করা সবই চলছে। এছাড়া বে-আইনী মসজিদ থেকে মাইক নিয়ে হল্লা দেওয়া ও নিত্য সভা করে হুমকি দিয়ে হিন্দুদের বাধ্য করছে অল্পদামে জমি-জায়গা বিক্রি করে অন্যত্র চলে যেতে। বিভিন্ন বাজারেও একই ভাবে একটা-একটা করে দোকান কিনে নিয়ে উৎপাত শুরু করছে। তোলার জুলুম ও অত্যাচারের দাপটে বাধ্য হয়ে হিন্দুরা ওইসব অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের কাছে দোকান বিক্রি করে দিচ্ছে। অনিচ্ছুক প্রভাবশালী হিন্দু ব্যবসায়ীদের 'ওরা' হত্যা করছে।

এইভাবে তারা ধীরে-ধীরে এক সুগভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্থানীয় হিন্দুদের জমি-জরু ও জান ছিনিয়ে নিচ্ছে এবং সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা হয়ে উঠছে। এরপর ভোটসর্বস্ব ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি মুসলিম ভোট পাওয়ার আশায় বিভিন্ন নির্বাচনে তাদেরকে প্রার্থী করছে এবং হিন্দুদের নির্বুদ্ধিতায় ওইসব সন্ত্রাস অনুপ্রবেশকারীরা জিতেও যাচ্ছে। তাই সাধু সাবধান। এখনও সময় আছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জমি-জরু ও জান বাঁচাবার জন্য ভেবে চিন্তে ভোট দিন।

--সুকল্যাণ বৈদ্য, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা

সমাবেশ সমাচার

জনজাগরণে বিদ্যার্থী পরিষদ

শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলিম তোষণ বন্ধ, আফজল গুরুর ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা, অনুপ্রবেশ রোধে পদক্ষেপ নেওয়া ইত্যাদি একগুচ্ছ দাবিকে সামনে রেখে মহানগরীর রাজপথে নামল দেশের বৃহত্তম জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। প্রসঙ্গত, দেশের ভোটারদের সবচেয়ে বড় অংশ অর্থাৎ ছাত্র-যুব ভোটাররা রাজনীতির কারবারীদের ক্ষমতা দখলের কারসাজিতে দেশের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে অনেকটা দূরে সরে যাচ্ছে বলে পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই কারণেই গৃহীত হয়েছিল দেশজুড়ে জনজাগরণের কর্মসূচী। এরাজ্যেও বিভিন্ন স্থানে এই কর্মসূচী পালিত হয়। গত ৬ মে বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে এই জনজাগরণ কার্যক্রম নেওয়া হয়। এই কার্যক্রমের শুভসূচনা করেন পরিষদের রাজ্য সম্পাদিকা পারুল মণ্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহ-সভাপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, কলকাতা জেলা প্রমুখ অভিজিত বিশ্বাস ও মহানগর সংগঠন সম্পাদক কিশোর বর্মন। কয়েকদিন ব্যাপী এই কার্যক্রম উপলক্ষে একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো মহানগরীর অলি-গলিতে পরিক্রমা করে।

হিন্দু মহাসভার প্রস্তাব পেশ

গত ২৭ এপ্রিল হিন্দু মহাসভার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। হিন্দু মহাসভার সক্রিয় কর্মী নিরঞ্জন চাউল্যার সভাপতিত্বে এই সম্মেলন পরিচালিত হয়। সভায় সর্বসম্পতিক্রমে একটি প্রস্তাবে নেপাল সরকারের গীতার ওপর বাধা-নিষেধসহ হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে।

অর্শ চিকিৎসা শিবির

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পরিচালনায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়ার বলরামপুরে একটি অর্শ চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডাঃ বি সি সাহা রোগীদের চিকিৎসা করেন। ৫৫ জন রোগীকে এদিন সুস্থ করে তোলা হয়। শিবির পরিচালনায় এগিয়ে আসেন আশ্রমের কার্যকর্তা ও বিদ্যার্থীরা। শিবিরকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যেও উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল যথেষ্ট।

♠♠♠

সেবা ভারতীর পরিচালনায় গত ১১ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার গাংনাপুর এলাকার অরুলীতে ও ১৩ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার ভেবিয়াতে ২টি অর্শ চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। দুটি শিবিরে ৫৪ জন রোগী তাদের চিকিৎসা করান। বিশিষ্ট অর্শ চিকিৎসক ডাঃ বি সি সাহা রোগীদের চিকিৎসা করেন। সঙ্ঘ ও সেবা ভারতীর কার্যকর্তারা উক্ত শিবিরগুলিতে উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব সৈনিকপরিষদের ফৌজদিবস

গত ২৫ এপ্রিল পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের নেতৃত্বে পালিত হল আজাদ ফৌজ দিবস। কলকাতায় সঙ্ঘের প্রাদেশিক কার্যালয় কেশব ভবনে মেজর জেনারেল কে কে গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অরুণ মজুমদার, প্রসিদ্ধ নেতাজী গবেষক অধ্যাপিকা ডঃ পূরবী রায়, শ্রীমতী তারা সেন প্রমুখ। এদিন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নেতাজীর বড় ভাই স্বর্গত সতীশ চন্দ্র বসুর পৌত্র চিত্রপ্রিয় বসু। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ক্যাপ্টেন সুশান্ত কুমার দে।

শোক সংবাদ

চলে গেলেন হাওড়া জেলা সঙ্ঘচালক রুধির রঞ্জন নায়েকের মাতৃদেবী পূর্ণময়ী নায়েক। গত ২৩ এপ্রিল ভোরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর।

♠♠♠

সঙ্ঘের শিলিগুড়ির গ্রামীণ মহকুমা কার্যবাহ তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের ধর্মাচার্য সম্পর্ক প্রমুখ অসিত কুমার ভট্টাচার্যের মাতৃদেবী গত ২৫ এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও নাতি-নাতনী রেখে গেছেন।

পরম্পরা

ভক্তাধীন ভগবান

সন্ত বল্লভদাস

ভক্ত সঙ্গে রহি আমি ভক্ত অঙ্গে বাস।
যাহার চরণধূলি করে বিঘ্ননাশ।।

বৈদেহীনন্দন রায়

তিনি কেবল ভক্ত নন, ভক্তশিরোমণি। অন্তত গুজরাটবাসীদের চোখে। তিনি শ্রীমদভাগবতোক্ত সেই মানুষ, যিনি চেতন, অচেতন সর্বভূতে ঈশ্বরকে অভিন্নভাবে দর্শন করেন, প্রণাম করেন এবং তদ্চিন্তায় রত থাকেন।

সেই ভক্তশিরোমণি বল্লভদাস একবার পথে বার হলেন। গন্তব্যস্থল ব্রজভূমি। সেখান গোবর্ধনে দর্শন করবেন শ্রীনাথজীকে (বর্তমানে যিনি রাজস্থানের নাথদ্বারায়)।

বল্লভদাসজী প্রবাসে গেলে তাঁর সাথে থাকত তিনটি পাত্র। একটি কাঁধে, একটি কোমরে ও অন্যটি পিছনে বাঁধা অবস্থায়। কাঁধের পাত্রে হতো হাত মুখ প্রক্ষালন। কোমরের পাত্রে ইষ্টসেবার কাজ। আর পিছনের পাত্রের দ্বারা সারতেন শৌচাদি কর্ম। চলার পথে কোনও গ্রাম পড়লে ভিক্ষা করে আহার্য বস্তু সংগ্রহ করতেন। তারপর স্বহস্তে পাক করে প্রভুকে নিবেদনান্তে সেই প্রসাদ গ্রহণ করতেন।

এইভাবে চলে পথ চলা। একদিন পথিমধ্যে নামে প্রবল বর্ষণ। বর্ষণ থামার লক্ষণ নেই। কেটে যায় তিনদিন। অনাহার, অনিদ্রায় ক্লান্ত তিনি। তবুও এগিয়ে চলেছেন। ভাবছেন এসময় কেউ যদি তাকে আহার্যদ্রব্য দেয়, তিনি সুস্থ বোধ করবেন।

বল্লভদাসজী এসে পৌঁছলেন এক জনপদে। রাজ্যের রাজা যথার্থ প্রজানুরঞ্জক ও অতিথিবৎসল। কিন্তু সুখী নন। চার রানীর মধ্যে কেউই অজ্ঞাত কারণে পুত্রলাভে সমর্থ হয়নি।

চেষ্টা রাজা কম করেননি। নানা পূজা অনুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু সব বিফলে গেছে। এর মধ্যে এক সদ্ব্রাহ্মণ রাজার অবস্থার কথা ভেবে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজা যদিও ঘোর হতাশায়, বিমুখ করলেন না তাঁকে। দশ হাজার মুদ্রা তাঁকে দিলেন যজ্ঞের নিমিত্ত। বাহ্মণ প্রাণপণ চেষ্টা করে যজ্ঞ শেষ করলেন। কিন্তু সাফল্য দেখা গেল না।

ব্রাহ্মণ ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় ভেঙে পড়লেন। ঠিক করলেন শরীর রাখবেন না। কিন্তু বাদ সাধলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি। দেখা দিয়ে নিষেধ করলেন আত্মহনন না করার জন্য। ব্রাহ্মণ সাশ্রুনয়নে বললেন, প্রভু, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তাহলে এ রাজ্যের রাজাকে পুত্রলাভে সমর্থ করুন। শ্রীহরি বললেন, ব্রাহ্মণ, রাজার সেসময় তো এখনও আসেনি। ব্রাহ্মণ রাজার কাছে সত্যরক্ষা হবে না ভেবে আকুল হয়ে বলে উঠলেন, প্রভু, আমার কথা মিথ্যা হলে আমি আপনার সামনেই প্রাণত্যাগ করব। ভগবান মুচকি হেসে বললেন, ব্রাহ্মণ ভেবো না, রাজার গ্রহের ফের কাটতে সামান্য সময় বাকী। তারপর দেখো।

স্বপ্নের ঘোর কাটতেই সম্বিত ফিরে পেলেন ব্রাহ্মণ। মনে পড়ল গীতার সেই অভয়বাণী---স্বল্পমস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। ধর্মের অনুষ্ঠান অল্প হলেও

তা সংসারের মহাভয় নিবারণ করে। আশ্বস্ত হলেন ব্রাহ্মণ।

সেই রাজ্যে থাকতেন অন্য এক ব্রাহ্মণ। প্রতিদিন ইষ্টদেবকে ভোগ নিবেদন করে, সেই প্রসাদী অন্ন একটি পুকুরের পাড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে জপে নিমগ্ন থাকতেন। জপ সমাপনান্তে উক্ত প্রসাদ তিনি কোনও সাধু-সন্ত, বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ অতিথিকে গৃহে বসিয়ে তৃপ্তি সহিত ভোজন করাতেন এবং অবশিষ্টাংশ নিজে গ্রহণ করতেন। কোনওদিন কোনও অতিথি না পেলে, সেই প্রসাদ কোনও গো-মাতাকে খাইয়ে বাকী অংশ নিজে নিতেন। এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন কর্মধারা।

সেদিনও তিনি পুষ্করিণী তীরে জপরত। ঠিক সেসময় সেখানে এসে উপস্থিত সন্ত বল্লভদাস। ব্রাহ্মণকে দেখে বল্লভদাসজীর আনন্দ হল। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণও বল্লভদাসজীর মতো বৈষ্ণব সন্তকে দর্শন করে আদিত ও উৎসাহিত। উভয়ে উভয়কে প্রণাম জানালেন।

ভক্ত ব্রাহ্মণ সানন্দে, পরম সমাদরে বল্লভদাসজীকে নিয়ে এলেন স্বগৃহে। প্রসাদ গ্রহণের জন্য বসালেন তাঁকে।

সেদিন ছিল ভগবান কৃষ্ণের বিশেষ উৎসব। প্রসাদও নিবেদিত হয়েছিল সেইভাবে। নানা ব্যঞ্জনে। তিনদিন অভুক্ত বল্লভদাস। পরম পরিতোষ সহকারে সেই শ্রদ্ধা নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে বললেন---ভাই, তিনদিন অনাহারের সাথে নিদ্রাহীন ছিলাম আমি। এবার একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থা করো।

ভক্ত ব্রাহ্মণ নিজের গৃহে একটি নির্জন কক্ষে বল্লভদাসজীর শয্যা রচনা করে তাঁকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন ও সারাদিন তাঁকে পাখার বাতাস দিয়ে সেবা করলেন।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা এল। সন্ধ্যারতির সময় ব্রাহ্মণ বল্লভদাসজীকে সন্ধ্যারতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বল্লভদাসজীর শরীর থেকে এখন ক্লান্তি অপসৃত। উভয়ে ভগবানের সন্ধ্যারতিতে অংশ নিয়ে প্রসাদ আহারান্তে সৎসঙ্গে বসলেন। চলল গভীর রাত পর্যন্ত। সারারাত ব্রাহ্মণ পাখার ব্যজনে সেবা চালালেন।

প্রত্যুষে উঠে বল্লভদাসজী প্রাতঃকর্ম সেরে ব্রাহ্মণকে বললেন---ভাই, এবার আমায় বিদায় দাও।

ভক্ত ব্রাহ্মণ শুনে ককিয়ে উঠলেন---না, না প্রভু, আপনি অভুক্ত অবস্থায় যেতে পারবেন না। দুপুরের প্রসাদ গ্রহণের পর বিশ্রাম করে তবে----।

মুগ্ধ হলেন সন্ত বল্লভদাস ব্রাহ্মণের প্রেম, ভক্তি, অতিথিপরায়তা দেখে। রাজি হলেন। দুপুরে প্রসাদ ও বিশ্রামান্তে বিদায়বেলায় বল্লভদাসজী ব্রাহ্মণকে বললেন---ভাই, সাধু গ্রহণের বিনিময়ে সবসময় কিছু দেয়। তুমি প্রার্থিত বর চাও।

ব্রাহ্মণ বললেন আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে---প্রভু, ভগবান শ্রীব্রজবিহারী আমায় তো সব দিয়েছেন। অভাব তো নেই কিছু। কি চাইব।

বল্লভদাসজী বললেন----ব্রাহ্মণ সব জানি। তবু সৎবৈষ্ণবের বাক্য মিথ্যা হয় না। আমি সংকল্প করেছি তোমাকে কিছু

(এরপর ১৪ পাতায়)

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উদররোগের চিকিৎসা

রবীন সেনগুপ্ত

উদর বা পেটের নানা প্রকার ব্যাধি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খুবই সাধারণ বিষয়। জলে আয়রণের আধিক্য, খাদ্য বিজ্ঞান মেনে না চলা, নিয়মিত ব্যায়াম প্রাতঃভ্রমণ ইত্যাদি না করা থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদর ব্যাধির সৃষ্টি হয়। উদর রোগ আয়ুর্বেদ মতে অষ্ট প্রকার। যথা---বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, বঞ্চনজ, প্লীহা, ক্ষতজ ও উদকজ। বায়ুজ বা বাতজ উদর রোগে হৃদয়, নাভি, কোমর ও পায়ুস্থানে ব্যথা হয়। অজোরে অধোবায়ু নির্গত হয়, প্রস্রাব কম হয়। মুখ ও মন সর্বদাই মলিন থাকে। পিত্তজ উদর রোগে জ্বর-জ্বর ভাবের সৃষ্টি হয়। মুখ তেতো হয়ে থাকে। এই প্রকার উদর রোগে খাদ্য হজম হওয়ার সময় পেট জ্বালা করে। শ্লেষ্মজ উদররোগে শরীরের অবসন্নতা, অরুচি, ঘাম, শরীর ভারী ভাব ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

এ ছাড়া একধরনের উদররোগে পেটে জল জমে। অপরাপর উদরব্যাধির মধ্যে আছে অজীর্ণ বা খাদ্য হজম না হওয়া, অম্বল, গ্যাস, অতিরিক্ত ক্ষুধা অথবা একেবারেই ক্ষুধা না হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধ তা ইত্যাদি।

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তা প্রথমে পাকস্থলীতে পৌঁছালে সেখানে পাচকরস, যকৃতের পিত্তরস প্রভৃতির সাহায্যে অর্ধজীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অর্ধজীর্ণ খাদ্য পাকস্থলী থেকে গ্রহণী নাড়ীতে গমন করে। বিভিন্ন পাচকরস, পিত্তরস সম্মিলিত হয়ে গ্রহণী নাড়ীতে অবস্থিত অর্ধজীর্ণ খাদ্যকে সূর্যগ্রন্থিরস (Pancreas)-এর সহায়তায় সম্পূর্ণ জীর্ণ করবার ব্যবস্থা করে। গ্রহণী নাড়ীতে এই খাদ্য সম্পূর্ণ জীর্ণ না হলে তা পচে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এই অজীর্ণ খাদ্য অন্ত্রের পথ অবরুদ্ধ রাখে বলে বায়ু চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এই অবস্থায় দেহেশোধনকারী বায়ু দেহোৎপন্ন এই বিষকে নিঃশ্বাসের সাথে সম্পূর্ণ বার করে দিতে পারে না। অজীর্ণ খাদ্যকে মলনাড়ীও মলরূপে দেহ থেকে পুরোপুরি নিঃসারিত করতে পারে না।

মলের সাথে ওই বিষাক্ত রক্তকে শোধন করার জন্য প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি (কিডনী), ফুসফুস প্রভৃতি যন্ত্রকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। ফলে অনেক স্নায়ুই অসাড় হয়ে পড়ে। সমস্ত দেহেই তখন নান উপদ্রব সৃষ্টি হয়। গ্যাস্ট্রিক আলসার, পেপটিক আলসার, মূত্র পাথুরী, পিত্ত পাথুরী এইসব ব্যাধির উৎস হিসাবেও অজীর্ণতার ভূমিকা থাকে।

উদরাময় ব্যাধি নিয়ম মেনে চললে ঔষধ ও ব্যায়াম ছাড়াই নিরাময় হয়ে যেতে পারে। বর্তমানে যে প্রায় শতকরা একশো শতাংশ ব্যক্তিই নানা প্রকার পেটের ব্যাধিতে ভুগছেন। এর অন্যতম কারণ হল মানুষকে পূর্বে শাস্ত্রীয় আচার-বিচার-এর অঙ্গ হিসাবে অনেক কিছু মেনে চলতে হত, সেগুলিকে এখন প্রায় একেবারেই মেনে চলা হচ্ছে না। অনেকেই এখন বারে বারে চা, কফি, বিড়ি, সিগারেট, মদ, মাংস, তেলেভাজা গ্রহণ করে থাকে। একটু আধটু চা-কফি উপকারী হতে পারে, কিন্তু এসবের অতিরিক্ত ব্যবহার নিকোটিন, ট্যানিন, ক্যাফিনকে শরীরে জমে থাকতে সহায়তা করছে। খাদ্যে ভেজাল, পরিবেশ ও জলে দূষণ----এসবও প্রায় সকলের মধ্যেই আন্ত্রিক গোলযোগ ছড়িয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে গণ্য করা যাবে। পেশাগত এবং অবহেলাজনিত কারণে দুপুর বা রাত্রির খাবার অতিরিক্ত দেরি করে গ্রহণ করাটাও এই রোগগুলির একটা ফ্যাক্টর।

সর্বাঙ্গ আসন প্রতিদিন মিনিট চারেক, মৎস্যাসন ১ মিনিট, উষ্ট্রাসন চার বার, ভ্রমণ প্রাণায়াম, সহজ অগ্নিসার ক্রিয়া, বস্তিক্রিয়া এগুলি বিভিন্ন প্রকার উদরাময় রোগে যোগাসন পরামর্শ মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

অজীর্ণ রোগে নানা প্রকার আয়ুর্বেদিক ফর্মূলার মধ্যে একটিতে বলা হচ্ছে—
অপার্মাগস্য মূলঞ্চ সামুদ্রলবণস্তথা।
শ্বেতোদিত মজীর্ণস্য মূলস্যাপি বিম্মর্দনম।
রক্তোৎপলমার্গাং স্রোগেহঞ্জনং বচাতথা।
লবনেন সমং ভক্ষাচ্ছ্যাজীর্ণঞ্চ নশ্যাতি।।
এই সূত্রটিতে পরিমাণ মতো অপামার্গের শিকড়, সামুদ্রিক লবণ, বচ ইত্যাদির মিশ্রণে ঔষধ প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে।

রক্ত পায়খানা হলে, তালমূলীঞ্চ মধুনা সমভাগেন যঃ পিবেৎ। রক্তাতিসারং ক্ষয়ং জাতি নারিকেলজলং.. তথা অর্থাৎ এখানে তালের মূল মধু নারিকেল জল দ্বারা ওষুধ নির্মাণের সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

বহেড়া, শুণ্ঠী, সিদ্ধি পত্র, জোয়ানী ও সৈন্ধব লবণ---এই প্রতিটি বস্তু পৃথক পৃথক চূর্ণ করে কাপড়ে ছেঁকে চিনি আধসের দিয়ে পাক করে আধতোলা প্রমাণ বটী করে প্রতিদিন একবটী ভক্ষণ করলে, আমাশয় ভালো হয়।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, সোহাগা, যমানী ও চিতার মূল সমভাগে চূর্ণ করে তপ্তজলসহ পান করলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

যবক্ষার ও শুণ্ঠী চূর্ণ করে ঘৃত দ্বারা গ্রহণ করলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। জাম, ছোলঙ্গ, শিরীষ, অপামার্গবীজ ও সর্ষচূর্ণ ছাগদুগ্ধ দিয়ে সিদ্ধ করে গ্রহণ করলে ক্ষুধাবৃদ্ধি ঘটে। রক্ততিসার ব্যাধিতে মস্তশর্করা ব্যবহার করা যায়। আম্রছাল বেঁটে কাঁথীর সাথে গ্রহণ করলে রক্তাতিসার দূর হয়।

তন্তুলোদক শর্করাসহ গ্রহণ করতে গ্যাস দূর হয়। তেউড়ী ও গুড় দ্বারাও বায়ুরোগ নাশ করা যায়।

আধুনিক মানুষের একটা অংশ আজও প্রাচীন সনাতন হিন্দু শাস্ত্রচর্চা করেন, যতটা পারেন শাস্ত্রবিধি মেনে চলেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এগুলিকে কুসংস্কার মনে করে চরম অবজ্ঞা করেন। ঈশ্বর তখন রোগ ব্যাধি দিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রবিধিগুলি মানতে বাধ্য করে। মানুষকে শাস্ত্রের সত্যতা বুঝিয়ে দেন। তাই আস্তে-আস্তে অনেকেই আজকাল এসব নিয়ে চর্চা করছেন, এগুলিকে মান্যতা দিচ্ছেন। হিন্দু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চর্চা তাই অব্যাহত থাকুক।

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়

নারী শক্তির যেখানে প্রাধান্য

ইন্দিরা রায়

ক্ষুদ্র সংসার থেকেই বৃহৎ সমাজ গড়ে ওঠে। সমাজের ব্যাপ্তি ঘটে ক্ষেত্র বিশেষে। সমাজবদ্ধ জীব জন্মলাভ করে ধীরে ধীরে বড় হয়ে পৃথিবীর সুখ, অর্থ ও খ্যাতিলাভের জন্য নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। সবকিছু লাভ করার পরও কিন্তু প্রকৃত শান্তি সে লাভ করতে পারে না। সুখ-সমৃদ্ধি অর্থের মধ্যে দিয়ে শান্তি পাওয়া যায় না। প্রকৃত শান্তি আসতে পারে একমাত্র নিজেকে জানার মধ্যে। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় আছি, কোথায় যেতে হবে, আর আমার জীবনের আসল কর্তব্য কী— এই আত্মোপলব্ধি যথাযথ হলে তবেই মানুষ জনম সার্থক হয়। 'আমি' শব্দের পরিভাষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের হিন্দু সমাজে এই পথ নির্দেশিত করার নানা উপায় আছে। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল আজ থেকে তিয়াত্তর বছর আগে— ১৯৩৭ সালে পরমপিতা দাদা লেখরাজের মধ্য দিয়ে পরমাত্মার প্রকাশ ঘটার ফলে। সেই প্রতিষ্ঠানের নাম— প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই সংস্থা সম্পর্কে জেনে রাখা ভাল, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা

দাদা লেখরাজ সম্পর্কে কিছু কথা।

তিনি ছিলেন সিন্ধি। ছোট থেকেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসু মন তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন বিষ্ণুর পরম ভক্ত। নিয়মিত গীতাপাঠ করতেন। কলকাতায় নিউ মার্কেট এলাকায় তিনি ছিলেন হীরের ব্যবসায়ী। প্রচুর অর্থ- সম্পত্তি তাঁকে সংসারে প্রকৃত শান্তি দিতে পারেনি। আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে জীবনে বারোজন ধর্মগুরু করেছিলেন। কিন্তু এরপরেও তিনি ঈশ্বরের সন্ধান করেছেন। শেষ পর্যন্ত পরিণত বয়সে অর্থাৎ ষাট বছরে তাঁর মধ্যে পরমাত্মার সিদ্ধি লাভ ঘটে। তখন তিনি তাঁর যাবতীয় অর্থ সম্পত্তি বিশ্বসেবার মহান কাজে নিয়োগ করেন। তিনি 'প্রজাপিতা ব্রহ্মা' রূপে চিহ্নিত হন। 'প্রজাপিতা ব্রহ্মা' তিনিই যিনি জ্ঞান ও সহজ রাজযোগ দ্বারা বিশ্বের মহাপরিবর্তন আনতে এবং শান্তি স্থাপনার্থে শিবের জ্যোতির্বিন্দু যে মানুষের মধ্যে দিব্য প্রবেশ ঘটে। 'ব্রহ্মাকুমারী' শব্দের অর্থ নারী, শক্তি। যার হাতেই পরমপিতা দিয়েছেন জ্ঞানের কলস। 'কুমারী' শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ যথেষ্ট গভীর। নারীই হল সর্বপ্রথম। নারীশক্তির মধ্যে বুদ্ধি, বিদ্যা ও ধন নিহিত আছে। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর আরাধনা করে পুরুষ বিদ্যালাভ করে। লক্ষ্মী হলেন ধনলক্ষ্মী। তাঁকে ধরে পুরুষ ধন লাভ করে।

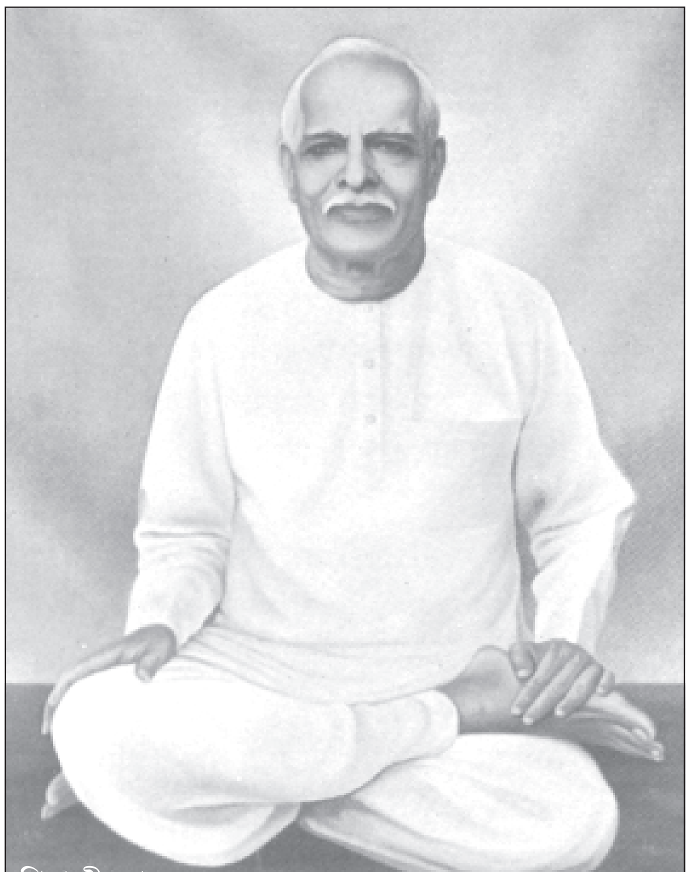

পিতা শ্রীব্রহ্মা

কুমারী নারী মাতৃশক্তি। কুমারী পুজোর কথা আমরা জানি। দেবী দুর্গার অষ্টমী পুজোয় সকালে কুমারী পুজো হয়। তারপর সেই ফুল-জল দিয়ে মা'কে পুজো করা হয়। এই রকম আমাদের পৌরাণিক কাহিনীতে দেখি, রাম-সীতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, শিব-দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ, নারীই শক্তি যেখানে, দেবতারাও তার স্তব করতে বাধ্য হন।

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমপিতা নারীদের প্রাধান্য দিয়েছেন। জীবনের চক্রে নারীর ভূমিকা প্রধান। তাই নারী আগে, তারপর পুরুষ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলতে কোনও জপতপ শাস্ত্রচর্চা হয় না। সাধারণ মানুষকে শান্তির পথ প্রদর্শনের জন্য সকালে প্রতিদিন ৭টা থেকে আধ্যাত্মিক ক্লাস ও মেডিটেশন হয়। আধ্যাত্মিক ক্লাসে সাধারণত আত্মা, রাজযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক শিক্ষিকা ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে জানা গেল— আত্মা হল মন, বুদ্ধি ও সংস্কার। মনের কাজ ভাবনা, বুদ্ধি হল নির্ণয়। এই তিনের মিশ্রণের ফলই হল চেতনা। জন্মজন্মান্তর এই চক্রাকারে আত্মা জীবের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু আত্মা অবিনাশী। সে আগুনে পোড়ে না, জলে ভাসে না। কিন্তু দেহ বিনাশী। সংস্কার সেই আত্মার সঙ্গে লিপ্ত। কর্মের মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ ঘটে। আমাদের শরীর পঞ্চ তত্ব দ্বারা গঠিত। কিন্তু এই দেহ মরণশীল। তাই দেহ থেকে আত্মা চলে গেলে দেহ পঞ্চ ভুতে বিলীন হয়। মানুষের শরীরে আত্মা প্রবেশ করে তার কর্ম করে এবং তার ফলে পুণ্যাত্মা, পাপাত্মা, ধর্মাত্মা, দেবাত্মা তৈরি হয়। কিন্তু পরমাত্মা সব কিছুর উর্ধে। যিনি জন্মচক্রে আসেন না, তিনি সব আত্মার পরমপিতা, স্বয়ম্ভু।

রাজযোগের মধ্যে দিয়ে চিত্তশুদ্ধি হয়, আধ্যাত্মিক পথে স্থিতি আসে। তার নিয়মিত অভ্যাস প্রয়োজন। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে চলাফেরা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে পরমাত্মার চিন্তা, মনন অবশ্যই দরকার। তবেই মনে একাগ্রতা আসে। মেডিটেশন অর্থাৎ পরমপিতার ধ্যান করতে পারা, আমাদের জীবনে পরিবর্তন আসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপক স্বয়ং পরমপিতা নিজে নেপথ্যে থাকতেন। ১৯৬৯ সালে তাঁর আত্মা পার্থিব শরীর ছেড়ে যাবার পর, তাঁরই প্রদর্শিত পথে চলতে গিয়ে সারা বিশ্বে বর্তমান প্রায় ন'হাজার সংস্থা গড়ে উঠেছে। মূল কেন্দ্র রাজস্থানের আবু পর্বতে। এখানে সাধারণ মানুষের ক্লাস করার সুযোগ আছে— জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে। যারা সম্পূর্ণভাবে সংসারের আবর্ত থেকে সরে এসে এই সংস্থায় নিজেকে নিয়োগ করেন, তাদের বলা হয় ব্রহ্মাকুমারী— সংস্থার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মনকে শুদ্ধ রাখতে সাদা শাড়ি সাদা ব্লাউজ পরেন। তবে পোশাকের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই। নিজের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। ক্লাস ছাড়াও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে এঁরা সময়ে সময়ে পরমপিতার ধ্যানে মগ্ন হন। যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথে আসতে আগ্রহী, তাদের অন্তত কিছুদিন ক্লাস করতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, বাস্তব জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণা স্পষ্ট থাকা দরকার। সেই সঙ্গে মনকে তৈরি করতে হবে। সারা বিশ্বে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য আছে এক ট্রাস্ট। ২৩/৪, সি, রায়বাগান স্ট্রীট শাখার প্রধানা হলেন বিন্দুবহিনজী। এখানে আধ্যাত্মিক শিক্ষিকা হিসেবে যাঁরা আছেন, তাঁরা শিক্ষিত এবং এ পথের আদর্শ উপলব্ধি করে আনন্দে আছেন পরমব্রহ্মার সাধনায়। এখানে নিয়মিত ক্লাস করতে আসেন, তাদের বেশিরভাগই অবাঙালী। বাঙালীও আছেন। বিশ্ববাসীর জন্য এ পথ খোলা। যাঁরা যোগাযোগ করতে চান, তাদের জন্য ওই শাখার ঠিকানা জানিয়ে দেওয়া হল— প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ২৩/৪-সি, রায়বাগান স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৬, দূরভাষ ঃ ২৫৫৫৭০৭৩।

চিত্রকথা ।। অমর শহীদ মহান বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ।। ৪

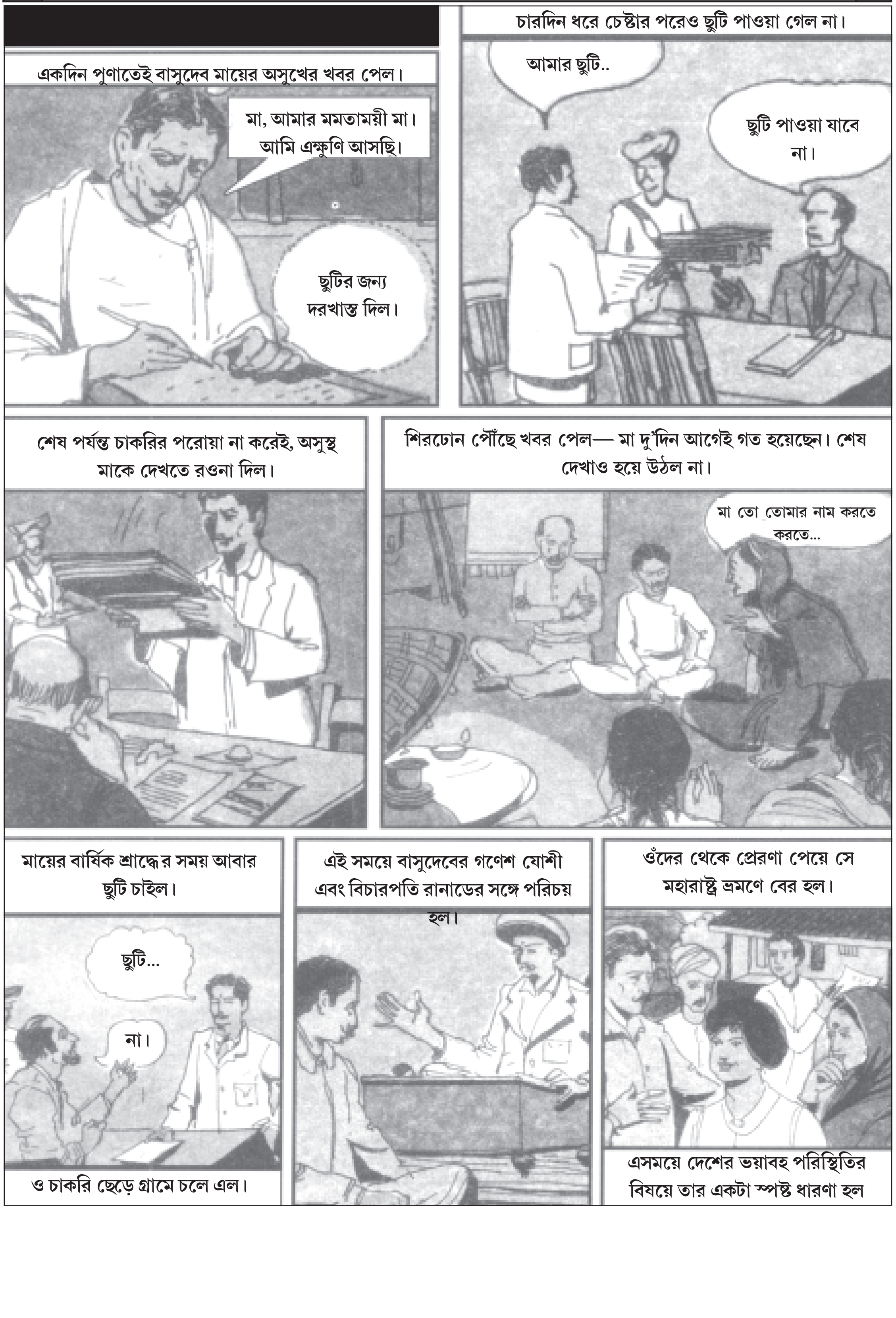

গান্ধী-নেহরু গোষ্ঠী ও সংবাদ মাধ্যম

শিবাজী গুপ্ত

এই লেখা প্রকাশ হবার আগেই ভোটপর্ব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে যে ভোটরঙ্গ দেখা গেল, তার তুলনা পৃথিবীতে মেলা ভার। রূপে ভোলাতে না পেরে ভোটারদের ভঙ্গি দিয়ে ভোলাবার কতসব প্রাণান্তকর ও হাস্যকর প্রচেষ্টা!

স্পোর্টস্ বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় “গো অ্যাজ ইউ লাইক” বা “যেমন খুশি সাজ” বলে একটা আইটেম থাকে। দর্শকবৃন্দ এই কৌতুকপর্বটি প্রাণভরে উপভোগ করে। রাজনীতি ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিযোগিতাতেও ভোটারদের চোখে ধূলা দেবার রেওয়াজ খুব জোরালোভাবে চলছে। প্রথমে ধর্মের কথাই ধরা যাক। রাজনীতিতে ধর্মকে জড়ানোর বিরুদ্ধে সবাই বড়-বড় কথা বলে। এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ডুগডুগি বাজায়। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ভোটের জন্য---

“ কেহ নাখোদা মসজিদে গিয়ে,
সেজদা দিয়ে পড়ে খোদার পায়,
কতো মোনাজাত জানায়;
ফিরে যেন গদি পাওয়া যায়।
আল্লা হো বিস্‌মিল্লা বলে,
মিশে যান মোল্লার দলে,
যা হতো না ভোটের বলে--
কাছা খুলে তা করেন আদায়।।”

রাজনীতিকদের এই ফাঁকিবাজি ও ধোঁকাবাজি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজসচেতন কবিয়ালের চোখকে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারেনি। অসভ্য ও অশিক্ষিত জনগণকে ধোঁকাবাজিতে ভুলিয়ে রাখার বাজিগরি শুরু করেন রমণীমোহন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু। তিনি কাশ্মীরে গিয়ে যৌবনমদেমত্তা সুন্দরীদের মাঝে ফুটন্ত গোলাপের মতো বিরাজ করতেন। কুলু-মানালীতে গিয়ে কিন্নরীদের নাচের ছন্দে পা মেলাতেন, নাগাল্যান্ডে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নাগাদের সঙ্গে নর্তনকুর্দন করতেন, সাঁওতালদের বাজনার তালে মাথা দোলাতেন কিংবা মধ্যভারত ও অন্ধ্রপ্রদেশে বাঞ্জারাদের লোকগীতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাতেন।

কখনও কোনও আদিবাসী শিশুকে আচকান বাঁচিয়ে তুলে ধরতেন। আর বশংবদ সংবাদমাধ্যম নেহরুর এসব বাচালতাকে চিরশিশু নেহরুর জনগণপ্রীতির নিদর্শন হিসাবে প্রচার মাধ্যমে ঢাক বাজাতেন। পূর্বোক্ত কবিয়াল নেহরুর এসব উদ্দেশ্যমূলক বালখিল্যপনাকে ব্যঙ্গ করে গেয়েছেন ঃ

“জয় জয় মোদের জহরলালের জয়।
তিনি আসর বুঝিয়া নাচিয়া গাহিয়া--
করেন কত অভিনয়।।
সিকিম ভূটান চীন-জাপানে,--
আসর মাতান নাচে গানে,
বহুরূপী বিদ্যার গুণে---
করেন দিগ্বিজয়।।
আবার কাল সেজে কেরালায়,
রুদ্রতালে নিরালায়,---
নাম্বুদ্রিপাদ করেন লয়।।
সেজে পাকিস্তানের মিতা,
নুনের সঙ্গে কুটুম্বিতা,
লেডী নুনের চটি-জুতা,
সযতনে বয়।।
তিনি কেটে ছেঁটে সংবিধান,
বেরুবাড়ি করেন দান,
পাকিস্তানের মন করিতে জয়।
এ জহর সে জহর নয়।
জয় জয় মোদের জহরলালের জয়।।

নেহরুজীর এই লোক মজানোর কারসাজি ও ভেলকীবাজি তার বংশধরগণের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। নেহরুর পর তার কন্যাও আদিবাসী ও বনবাসীদের সঙ্গে নাচের মহড়া দিতে শুরু করেছিলেন এবং শেষকালে ইমার্জেন্সিরূপী তাণ্ডব নৃত্যে সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। প্রতিবাদে ভোট যুদ্ধে ভারতবাসী এমন তুর্কিনাচন নাচল যে ইন্দিরা গান্ধী ও তার দলবল ফুৎকারে উড়ে গেল। তার জায়গায় তার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীব গান্ধী এসেও নেহরু পরিবারের ঐতিহ্যানুসারে জনজাতিদের নৃত্যকলায় পায়ে খড়ি দেওয়া শুরু করতেই লঙ্কাকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে মরলেন। নেহরু-গান্ধীদের অবসানে এই রাজনৈতিক নৃত্যে সাময়িক বিরতি ঘটে। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, নরসীমা রাও, দেবগৌড়া ও অটলবিহারী বাজপেয়ী ও মনমোহন সিং এই নৃত্যেরই তালে তাল

> “সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা মালিকের দাস; মালিকেরা একদিকে কংগ্রেস ও নেহরু গান্ধী বংশের দাসের দাস; অপরদিকে পেট্রো-ডলারের ক্রীতদাস। সুতরাং খাঁটি সংবাদ প্রচারের আশা দুরাশা মাত্র।”

পা মেলাতে পারেননি। কিন্তু নেহরুজীর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ সোনিয়াপুত্র রাহুল গান্ধী ক্ষমতার দোরগোড়ায় পা দিয়েই আবার নাচের আসর শুধু নয়, আরও নানারকম ভেলকীবাজি শুরু করেছে।

রাজনৈতিক প্রচারে বেরিয়েই রাহুল গান্ধী হঠাৎ হঠাৎ লক্ষ-লক্ষ সরকারি টাকায় গড়া নিরাপত্তা বলয় ভেঙে রাস্তার পাশে জনগণের পাশে ছুটে যান। তাদের হাতে হাত মেলান। কখনও বা রাস্তার পাশের চায়ের দোকানের বাঁশের মাচায় বসে পড়েন এবং সস্তা বিস্কুটে কামড় মারেন। আবার বস্তিতে ঢুকে আহাররত কোনও বুড়ির থালা থেকে চাপাটি ছিঁড়ে মুখে পোরেন। কিংবা দরিদ্র পল্লীবাসীর ঘর থেকে জল চেয়ে খান। ধূলিধূসরিত শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করেন বা মেয়েদের গাল টিপে দেন। কখনও বা আদিবাসী মাদল বাজান বা বনবাসী শিরস্ত্রাণ পরিধান করেন। পথিপার্শ্ব গরু- মোষ শুয়ে থাকলে তাদের মুখে ঘাস তুলে ধরেন। সেইসঙ্গে উপজতি নর-নারীদের নৃত্যেরই তালে-তালে পা মেলাবার অক্ষম প্রচেষ্টা তো আছেই। নেহরু গান্ধী বংশে হিন্দু ও হিন্দুধর্মের প্রতি তিলমাত্র আসক্তি ও অনুরাগ না থাকলেও রাহুল গান্ধী কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা পরে মুর্খ হিন্দুদের হৃদয়জয়ের অভিনয় করেন, তা কি বুঝতে কারো বাকি আছে।

এখন শুধু একা পুত্র রাহুল নয়, সোনিয়া গান্ধী তার মেয়ে প্রিয়াঙ্কাকেও মাঠে নামিয়ে দিয়েছে। ভোঁদামার্কা পুত্র হালে পানি পাচ্ছে না বলে সুদর্শনা প্রিয়াঙ্কা বঢ়রাও ভাইয়ের সঙ্গে ভোট নৃত্যে সামিল হয়েছে এবং পথেঘাটে মহিলা ভোটারদের সঙ্গে মেশামেশি ও ঘেঁষাঘেঁষি করে নিজেদের দায়ী জনতার অংশ বলে পরিচয় দিতে লেগেছে।

শুধু তাই নয়, সোনিয়া গান্ধী নিজেও এই পারিবারিক ভোট রঙে সামিল হয়েছে, ছেলেমেয়েদের ভোট প্রচারের ঘাটতি পূরণে।

সোনিয়া গান্ধী নিজে জাত খৃস্টান। মুসলিম ঔরসজাত রাজীব গান্ধীকে খৃস্টান বানিয়ে বিয়ে করেছেন। মেয়েকে খৃস্টানের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন; ছেলেও খৃস্টান মেয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা যুৎসই হয়নি বলে বোধহয় পুত্রবধূকে এখনও আসরে নামানো হয়নি এবং রাহুল গান্ধী ব্যাচেলার ভেক নিয়ে ঘুরছেন এবং ছেমড়াছেমড়িরাও তার স্পর্শ পেয়ে আঃ কি সুবাস বলে নিজেদের চৌদ্দপুরুষের জন্মসার্থক মনে করছে।

খেল জমেছে ভালো। এইমাত্র যাকে শালা বলে গালি দিচ্ছে, পরমুহূর্তে তাকে মামা বলে কোলাকুলি করছে। বিশেষ এক ধর্মাবলম্বীর মতো শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে এদের সম্পর্কের কোনও বাছবিচার নেই দেখেছি। আর থাকবেই বা কি করে? একটা বংশে বিজাতি বিধর্মী রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে, তার তো রক্তের বিশুদ্ধতা থাকার কথা নয়। পশুদের মতো গম্য-অগম্য বোধ থাকে না।

ভেলকী সোনিয়া গান্ধীও কম দেখাচ্ছেন না। তিনি যে রাজ্যেই যান, সে রাজ্যের মহিলাদের মতো শাড়ি পরার ঢং নকল করেন। কোথাও লম্বা ঘোমটা দেন, আবার কোথাও ঘোমটা সরিয়ে হাসি ছুঁড়ে দেন। আবার কোনও ওড়না পায়জামা পরেন। কপাল জোড়া ধ্যাবড়া চন্দনের ফোঁটা দিয়েও হিন্দুয়ানি জাহির করতে চেষ্টা পান। তার মারাঠী মেয়েদের মতো কাছা দিয়ে শাড়ি পরতে অবশ্য এখনও দেখা যায়নি।

কংগ্রেসের ক্রীতদাস সংবাদ মাধ্যম নেহরু গোষ্ঠীর এই বহুরূপী সাজের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে আলঙ্কারিক ভাষায় প্রকাশ করে। উৎপাত চিৎপাত করে ছবি ছাপায়, টিভিতে প্রদর্শন করে। তারা রাহুলের মধ্যে নেহরুর ছায়া দেখতে পায়; প্রিয়াঙ্কার মধ্যে ইন্দিরার প্রতিবিম্ব দেখে। এবং দিল্লীর গদিতে যে এদের ছাড়া আর কারও অধিকার নেই, তা নিজেদের মা-বাপের দিব্যি দিয়ে প্রকাশ করে।

সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা মালিকের দাস; মালিকেরা একদিকে কংগ্রেস ও নেহরু গান্ধী বংশের দাসের দাস; অপরদিকে পেট্রো-ডলারের ক্রীতদাস। সুতরাং খাঁটি সংবাদ প্রচারের আশা দুরাশা মাত্র। এর সোনিয়া-রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে রক্ষাকর্তা হিসাবে তুলে ধরে যে দেশের বাকি সর্বনাশে মদত দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

গীতা চর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভারতীর অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গীতা চর্চার ক্ষেত্রে অভিনব উদ্যোগ হাতে নিয়েছে সংস্কৃত ভারতী। অনেকেই গীতার আঞ্চলিক অনুবাদ পাঠ করলেও, তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। মূল সংস্কৃত শব্দটা জানার ইচ্ছা জাগেই। যদিও সে অর্থ সকলের বোঝার উপায় থাকে না। সংস্কৃত ভারতী এরই ওপর এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংস্কৃতকে সহজ সরল ভাবে সবার সামনে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত শিক্ষণ বর্গ চালু করেছে তারা। যাতে গীতার মূল শব্দের অর্থ সহজে সকলে বুঝতে পারেন। এর ফলে সংস্কৃতের প্রকৃত স্বাদ পাচ্ছেন অনেকেই। যা আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ হওয়া গীতা-তে পাওয়া যায় না।

এই প্রক্রিয়াকে আরও প্রসারের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভারতী দেশের ৬টি স্থানে প্রশিক্ষণ শিবিরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ৬টি প্রশিক্ষণ শিবির হবে (১) কেরলের ত্রিশূর, (২) তামিলনাড়ুর মাদুরাই, (৩) অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দরাবাদ, (৪) মধ্যপ্রদেশের জববলপুর, (৫) ওড়িশার বরগড় ও (৬) অসমের নলবাড়িতে। প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার জন্য পুস্তক ছাপানোর কাজও ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ‘গীতা প্রবাস’ শীর্ষক পুস্তকের প্রথম খণ্ড বাজারে চলে এসেছে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ কুরুক্ষেত্রের (হরিয়ানা) কুবের মন্দিরে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সঙ্ঘের তৎকালীন অখিল ভারতীয় সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ দত্তাত্রেয় হোসবেলে উন্মোচন করেন। গীতার মাহাত্ম্যর কথা ভেবেই আমেরিকার সিটেন হল বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতাকে আবশ্যিক পাঠ্যসূচী হিসাবে রাখা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট স্কুলের ম্যানেজমেন্ট শিক্ষকরাও গীতার সাহায্য নিচ্ছেন।

গীতার ওপর ওই সমস্ত কর্মসূচীর প্রসঙ্গ উঠে আসে সংস্কৃত ভারতীর ১৬ তম বার্ষিক অধিবেশনে। সর্বভারতীয় স্তরের এই বৈঠক হয় হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে। গীতায় পুণ্যভূমিতে অনুষ্ঠিত হয় সমগ্র অনুষ্ঠানটি। ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি বৈঠক হয়। গীতার ওপর ভিত্তি করেই বৈঠক পরিচালিত হয়। এইসঙ্গে একটি বই মেলারও আয়োজন করা হয়েছিল। ‘সাধক স্মৃতি গ্রন্থ মেলা’ নামে পুস্তক মেলায় তিনটি বই প্রকাশিত হয়। যথা সমর্থ স্বামী রামদাস’, হূতাত্মা পদ্মিনী’ ও ‘মহাত্মা তুকারাম’। বই তিনটির লেখক রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী।

সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসারে সংস্কৃত ভারতী দেশজুড়ে কাজ করে চলেছে। তাতে যথেষ্ট সফলতাও এসেছে। সংস্কৃত ভারতীর অখিল ভারতীয় (প্রজেক্ট ইনচার্জ বা প্রকল্প প্রমুখ শ্রীল দেওপূজারী সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের কথা, যেমন সংবাদশালা-র কথা সবিস্তারে আলোচনা করেন। ২০০৮-এর মে থেকে ১৯’এর জানুয়ারি পর্যন্ত ওই কর্মসূচীতে ১৮টি ব্যাচ অংশগ্রহণ করেছে, সংস্কৃতে কথা বলা শেখার জন্য। ৬৩১ জন শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। যার মধ্যে ৩২ জন ছিলেন বিদেশের। বৃটেন, ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, নিকারাগুয়া ও নেপাল থেকে তারা এসেছিলেন। ১৩৪ জন মহিলা শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন। যারা পি এইচ ডি, এম ফিল কোর্স শেষ করেছে। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কেউ ডাক্তার, কেউ বা শিক্ষক। এছাড়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের বিদ্যার্থীরা এতে অংশ নেয়।

তৃতীয় প্রকল্প ‘শব্দ শালা’ প্রকল্পের কথাও দেওপূজারী তুলে ধরেন। এই কর্মসূচীতে সংস্কৃত শব্দের আধুনিক ব্যবহার প্রসঙ্গে বিশদে আলোচনা হয়। পাণিনীর ব্যাকরণ প্রসঙ্গেও ব্যাকরণবিদ্ তথা অধ্যাপকরা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সংস্কৃতকে আরও সহজ সরলভাবে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সংস্কৃত ভারতী ‘সরস্বতী সেবা যোজনা’ নামে একটি নতুন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। যার দ্বারা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় ও সহজ পদ্ধতিতে সংস্কৃত শেখানো হচ্ছে। ১৮টি জায়গায় সংস্কৃতের প্রশিক্ষণ ও ৩৫০টি বিখ্যাত গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া সংস্কৃত ভারতীয় আর একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে। শাস্ত্র সংরক্ষণ প্রজেক্ট। যার মূল বিষয় বেদ ও দর্শন।

খেলার জগৎ

জীবনকেও হারিয়ে দিয়েছেন মনোহর আইচ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯৫ বছর বয়সেও জীবনের চেয়ে বড় কিছু ভাবতে, করে দেখাতে সচেষ্ট হন যিনি, তাকে কি সম্বোধনে অভিহিত করা উচিত। 'সুপারম্যান' 'গ্রেট মাস্টার' শব্দগুলি বহু ব্যবহারে ফিকে হয়ে গেছে। তিনি মনোহর আইচ, স্বয়ং এক জীবনবেদ, এর চেয়ে ভালো অভিজ্ঞান আর কি বসানো যেতে পারে তার জীবনসভায়। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শের চলমান প্রতিভূ তিনি। নিজে কর্মযোগী, সমাজকেও বানাতে চান দেহ সৌষ্ঠবের সুষমায় পরিপূর্ণ এক অমৃতকুম্ভের ভাণ্ডার।

১৯১৪ সালের ১৭ মার্চ তার জন্ম। মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি পার করলেন ৯৫টি বছর। বাগুইহাটির যুগিনডার বাড়িতে বড় মেয়ে বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ ঘটা করে জন্মদিন পালন করলেন। জন্মদিনের রোশনাইয়ে তিনি ভুলে যাননি জীবনের মূলমন্ত্র। যুব সমাজের উদ্দেশ্যে তাই বলে ওঠেন, সুশৃঙ্খল জীবনমাত্রই হল মানব-জীবনের মূল আধার। সমবেত সুধীজনের উদ্দেশ্য বলে চলেন, টেনশন কমাতে, দীর্ঘ জীবন লাভ করতে ব্যায়ামের বিকল্প নেই। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভালো। আর তার জলন্ত উদাহরণ যে তিনি নিজেই। নিয়মানুবর্তিতা, সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার ফলে শত বছরের দোরগোড়াতেও যে মাথা উঁচু করে বাঁচা যায়, তা তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন।

১৯৫২ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে ইংল্যান্ডের দীর্ঘকায়, সুঠাম দেহী রেজিন্যাল্ড পার্ক, আমেরিকার গ্লিমেক, ফ্রান্সের ডন ফেরারোর মতো বডি বিল্ডারদের মতো সমান ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে নিজ ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ হয়ে বিশ্বশ্রী খেতাব অর্জন করেন মনোহর আইচ। এরপর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে একের পর এক খেতাব এসেছে তার ঝুলিতে। অথচ কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে জীবনটা শুরু করতে হয়েছিল তাকে। ভাই-বোনের দরিদ্র পরিবারে ভালো করে খাওয়াই জুটত না। শরীরচর্চা যেখানে বিলাসিতা ছাড়া আর কি হতে পারে! তবু এত সমস্যা, প্রতিকূলতার মধ্যেও, নুনভাত খেয়ে দেহ-মন্দিরের সাধনায়

নিজেকে সঁপে দিলেন মাত্র আট বছর বয়সে।

সশস্ত্র বিপ্লবীদের দেখে, দেশকে স্বাধীন করার উৎসাহে লাঠি ও ছোরা খেলায় নিজেকে পারদর্শী করে তোলেন। বিভিন্ন মেলায় ব্যায়াম ও শক্তি প্রদর্শনের খেলা দেখিয়ে অর্থ উর্পাজন করতে করতেই ১৯৪২ সালে এয়ারফোর্সে ফিজিক্যাল ট্রেনারের চাকরি পেয়ে যান। ১৯৪৪ সালে এক বৃটিশ অফিসারের সঙ্গে বাদানুবাদ হওয়ায় তাকে তুলে আছাড় মারেন। ফলে ৬ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৫০-এ স্বাধীন ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবসে অন্য বন্দীদের সঙ্গে তিনিও মুক্তি পান।

নানা বৈচিত্র্যে ভরা জীবনে লৌহমানব পেটের দায়ে খোলবাদক হয়ে কীর্তন দলে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেই কীর্তন গায়িকা যুথিকাদেবীর সঙ্গে পরিচয়। পরে পরিচয় থেকে পরিণয়। এটাই ছিল তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। 'যুথিকাই আমার জীবনের যাবতীয় কীর্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির চাবিকাঠি। ওর উৎসাহ ও প্রেরণায় আমি আজ বিশ্বশ্রী। ২০০১-এ যুথিকা মারা যাওয়ার পর থেকে আমি বড় একা'। লৌহপুরুষের গলায় বেহাগ রাগের করুণ সুর। সত্যি স্ত্রী চলে যাওয়ার পর থেকে বড় নিঃসঙ্গ তিনি। বিশাল বাড়ির সর্বত্রই তার স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে। নিজস্ব ব্যায়ামাগারেই বেশি সময় কাটে তার। অন্য ঘরে ঢুকলেই যে স্ত্রীর স্মৃতিপটের সসস্ত অনুপল, অনুপুঙ্খ চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মনকে ভারাক্রান্ত করে দেয়।

মাঝে মধ্যে মেয়েরা আসে, বাবার সঙ্গে কাটিয়ে যায় খানিকটা সময়। বাকি সময় তার সঙ্গী দুই ছেলে ও পাড়ার ছেলে-ছোকরার দল, যারা তার জিমনাসিয়াম মাতিয়ে রাখে। তার এখন একটাই লক্ষ্য শতায়ু হওয়া। তার মতে সুস্থ থাকার রসায়ন হচ্ছে সংযমী জীবন-যাপন ও সুষম ডায়েট। এখনও 'মনোহর ব্যায়াম মন্দিরে' দুই ছেলে বিষ্ণুপদ ও মনোজকান্তিকে নিয়ে দুই বেলা শিষ্যদের ব্যায়াম প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। মনোহর আইচের কৃতি ছাত্র হলেন ভারতশ্রী কমল ভাণ্ডারি, ক্ষিতীশ চ্যাটার্জি, সত্যেন দাস, শিবপ্রসাদ বসুরা। এছাড়া ভারতের শেষ বিশ্বশ্রী প্রেমচাঁদ ডোগরাও তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন একটা সময়ে।

এখনও ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠেন। উঠে প্রিয় কুকুর দুটি পুচু ও বুচুকে বাইরের লনে ছেড়ে দিয়ে আবার একটু ঘুমিয়ে নেন। সাতটায় পুরোপুরি উঠে বাড়িতেই কিছুক্ষণ জিম ও ব্যায়াম সেরে নেন। প্রেসার, সুগার নেই। চশমা ছাড়াই দিব্যি পড়তে পারেন খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন। ব্রেকফাস্টে একটা রুটি, ডাল তরকারি ও দুধ-চিনিসহ এককাপ কফি। দুপুরে অল্প পরিমাণ ভাত, মাছ, সবজি ও দুধ। জীবনে সিগারেট ছুঁয়ে দেখেননি, মদ্যপান তো দূর অস্ত। সেজন্যেই তিনি এই বয়সে এতটা সজীব ও সক্রিয়।

শব্দরূপ - ৫০৮

মধুপর্ণা বারিক

১	২			৩	■	■	৪
■		■	■		■	■	
■		■	■	৫	৬		
৭		৮	■	■		■	■
■	■		■	■	৯	১০	
১১			১২	■	■		■
	■	■		■	■		■
	■	■	১৩				

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. মহাভারত -এর এক জনৈক ঋষি, খগম নামে এক বন্ধুর শাপে নির্বীর্য সাপে পরিণত হয়, প্রথম তিনে হাজার সংখ্যা, চারে ঠ্যাং, ৫. নৃত্যরত শিব, ৭. দনুর পুত্র, দৈত্য, অসুর, ৯. স্ত্রী পরিচয়ে বিষ্ণু, নারায়ণ, ১১. প্রতিশব্দে অচল, অপ্রচলিত, ১৩. হনুমান বিশল্যকরণীর জন্য যে পর্বত তুলে এনেছিল।

উপর-নীচ ঃ ২. এইটি ভেঙ্গে রামচন্দ্র সীতা দেবীকে বিবাহ করেন, ৩. বিদর্ভরাজ ভীমের পুত্র, শেষ দুয়ে হৃদয়, ৪. মায়ের পরিচয়ে ভীষ্ম, ৬. সাদা এক পরিচিত ফুল, ৮. বিশেষণে বন্য, বর্বর, প্রথম দুয়ে মরচে, ১০. রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিতের এক নাম, আগাগোড়া চর্বি, ১১. ব্রহ্মার মানসী কন্যা ও শতানন্দের জননী, গৌতম ঋষির স্ত্রী।

সমাধান শব্দরূপ

সঠিক উত্তরদাতা

শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭

■	■	কা	লি	কা	পু	রা	ণ
ক	পি	ল	■	■	■	ধা	■
ণা	■	কা	মা	খ্যা	■	মা	■
দ	ল	■	■	তি	■	ধ	■
■	ব	■	ব	■	■	ব	লি
■	ণা	■	ক	দ	ম	■	গা
■	সু	■	■	■	হি	মে	ল
প	র	ম	পু	রু	ষ	■	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১ জুন ২০০৯ সংখ্যায়।

সন্ত বল্লভদাস

(১১ পাতার পর)

আমায় দিতেই হবে। তোমার প্রার্থনা কিছু না থাকে, তোমার সহধর্মিণীকে জিজ্ঞাসা করো।

একই কথা ব্রাহ্মণের স্ত্রীর। তবে একটি প্রার্থনা অবশ্য তিনি রাখলেন। বললেন--- আমরা যে রাজ্যে বাস করি, রাজ্যের রাজা প্রজাবৎসল, ধর্মপথগামী। কিন্তু তিনি দুঃখী। তাঁর কোনও পুত্রসন্তান আজও হয়নি। রাজ্যের ও রাজার মঙ্গলের জন্য তাঁকে একটি পুত্রসন্তান লাভের বর দিন। না হলে রাজার বংশ রক্ষা হবে না। রাজ্যও বিপদগ্রস্ত হবে।" স্ত্রীর সাথে ব্রাহ্মণও উক্ত প্রার্থনা জানালেন।

সন্ত বল্লভদাস ব্রাহ্মণ দম্পতির কথায় অতি প্রসন্ন। বললেন---একটি কেন। রাজার চারটি সন্তান হবে। এই বলে আবার পথে নামলেন বল্লভদাসজী।

ভক্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রসন্নতার প্রভঞ্জন বয়ে গেল। ভাবছেন---বৈষ্ণব সন্তের বাক্য মিথ্যা হওয়ার নয়। তিনি সেদিনই রাজার কাছে সন্ত বরদানের কথাটি জানালেন।

বৈষ্ণব বাক্য ব্রহ্মবাক্য। সত্যিই রাজার চার রানী কালক্রমে চার সন্তান প্রসব করলেন। রাজ্যে আনন্দের ঝড় বয়ে গেল।

এবার সেই পূর্বেকার পুত্রেষ্টি যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ সব জেনে ভাবলেন, আমি এত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করলাম, আর আমার দ্বারা কিছু হল না। আমি যে মিথ্যাচারী হয়ে গেলাম। ব্রাহ্মণের আবার আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিল।

ভগবান যে ভক্তাধীন। তিনি আবার দেখা দিয়ে বললেন---ব্রাহ্মণ, তোমার সেবায় কোনও ত্রুটি নেই। ভক্ত ব্রাহ্মণ যা করেছে তা সময় অনুসারে করেছে। তুমি যে যজ্ঞ করেছিলে, তা অসম্পূর্ণ ছিল। আর ওই ভক্ত ব্রাহ্মণ অতিথি যজ্ঞে তা সম্পূর্ণ করেছে। রাজা রানী, প্রজাবৎসল। কিন্তু প্রারব্ধ হেতু তাঁর এ দুর্ভোগ। তোমাদের উভয়েই যজ্ঞে রাজা প্রারব্ধ মুক্ত। তার ওপর বল্লভদাসের প্রেমে আমি বাঁধা। তাঁর কথা আমার কথা। তাঁর ইচ্ছার মর্যাদা দিতে রাজাকে আমায় পুত্রদান করতে হয়েছে। বস্তুত তোমাদের তিনজনের সমবেত প্রার্থনায় রাজার ফলপ্রাপ্তি। জেনে রেখো আমি ভক্তাধীন। ভক্তের ইচ্ছাপূর্তিতেই আমার আনন্দ।

এবারেও কী থেকে যাবে বত্রিশ বছ্ররের পাপ ?

বিশাখা বিশ্বাস

'দুঃসময়'-এর নায়ককে সাফ করে চলেছিল বন্দুকের নল, হুঁসিয়ার ছিলেন কাণ্ডারীগণ----নলের নিশানা লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়েছিল। শত্রুর দালাল নিশানা লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়েছিল। শত্রুর দালাল স্বগোত্রীয় বিগোত্রীয় মহম্মদীবেগেরা গোপনে প্রকাশ্যে ছুরিতে শান্ দিচ্ছিল---সতর্ক ছিল রাজ্য, উদ্যত সাপের ফণা নেমে আসার মতো হাতের ছুরিকা ধীরে নামিয়ে নিয়েছিল নানান গোত্রের প্রতিবাদী বান্ধব দল। ছল ও চাতুরি, ভঙ্গি ও প্ররোচনা এবং সত্য ও অর্ধমিথ্যা দিয়ে রাজার ঘণ্টাবাদক প্রচার মাধ্যমে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভাঙতে চেয়েছিল ঐক্য, প্রতিবাদী মিছিল থেকে বারেবারে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল তাদের লোকদের (তথাকথিত আমাদের লোকদের)--- চোখে জল আর জঠরে আগুন নিয়ে সজাগ ছিল মানুষ, ফেঁসে গেছিল সব ষড়যন্ত্রের জাল। যদিও ঠিক একই সারিতে একই স্লোগানে মিছিলে হাঁটেনি গৈরিক ঝান্ডার সহস্র শতদল, তবু, মানবতা ও মানবিক মূল্যবোধের হত্যাকারীদের প্রতিরোধ প্রতিবাদের কোনও ধারার সাথেই কোন শত্রুতা করেনি তারা, পরন্তু মূলশত্রু লাল-তেরঙ্গা শাসক-শোষকের, পরাজয় নিশ্চি তকরণকেই মুক্তির মন্ত্র বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল তারা। এবং, ঠিক সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ক্ষণটিতেই এরাজ্যের বুদ্ধি জীবীরা তাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম থেকে ডাক দিয়েছিলেন পরিবর্তনের। ঝড়ের গর্জনে উঠেছিল আওয়াজ ঃ বদলে দাও....পালটে দাও। বত্রিশটি বছরের পোকায় কাটা জীর্ণ দীর্ণ যেসব ঝড়তি-পড়তি পাতা, ধুলোবালি আবর্জনা----সব কিছুতেই ঝরিয়ে দাও...সরিয়ে দাও...।

গৈরিক ঝান্ডার নিজস্ব মিছিলের মানুষ মনে করেছিল পরিবর্তনের এই আওয়াজ অসংগত নয়, পরন্তু তা স্বভাবের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। "এ নির্বাচন তো রাজ্যের নয়, এ নির্বাচন এবার লোকসভার"---এই জাতীয় তত্ত্বকথার জাগলারি দিয়ে পরিবর্তনের এই আওয়াজকে লঘু করে দেওয়ার চক্রান্তকেও বুঝে ফেলেছিল গেরুয়া ঝান্ডা হাতে মানুষ, রাজ্যের সর্বশ্রেণীর প্রতিবাদী মানুষ। প্রতিবাদী শক্তির গলায় রাজ্যের ইন্টেলিজেন্সিয়ার পরিয়ে দেওয়া মর্যাদার 'টাই'টি দেখে ব্যর্থ আক্রোশে তাই নিজের টিকিটেই টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল ক্ষিপ্ত রাজশক্তি। তিনি দশকেরও অধিক কালের শাসনে শোষণে শিক্ষা ছিল না, স্বাস্থ্য হয়েছিল উধাও, বিদ্যুৎ পলাতক, কর্ম নিরুদ্দেশ , আইনরক্ষকেরা রাজার গোলাম---দিকে দিকে কেবল মদ রক্ত বমি বেয়নেট। রাজা তবু নিঃস্ব নয়, সাথে আছে সাধের 'তৃতীয় বিকল্প' (অনিল বিশ্বাস কথিত সেই ছাগলের তৃতীয় বাচ্চা)। এ ছাড়াও আরও আছে কিউবা, কোরিয়া, আছে ইরাক, আছে প্যালেস্টাইন, কোরিয়া, ঝলমলানো চীনের বস্তি (যে এখনও রাশিয়া হয়নি)। তবু রক্ষে, বিজেপি এবারে নাকি আসছে না, পাওয়াও গেছে সনিয়ার পা ধোয়াবার জন্যে মনমোহনের সস্নেহ হাতছানি---তাই শান্তি। ওঁম্ শান্তি ! !.....

মায়াকোভস্কির রচনা বগলে পুরে কার্ল মার্ক্সের পৌত্র-পৌত্রীগণ এখন তাই নির্ভয়ে টাটার কাগজ কুড়ায়, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট সোয়েকর্ণদের কবরখানার সেই মালগোছিকে ভুলে গিয়ে এখন তারা তারই সেই ঘাতক কুখ্যাত সালিম-হালিমদের এরাজ্যে লাল বাগিচার গোলাপের মালিকা পরায়, স্ট্যালিনের সাংস্কৃতিক বরপুত্রগণ সিঙ্গুরে-নন্দীগ্রামে-কোচবিহারে গুলি-বোমার শিল্পের কারখানা বানায়, ফ্যাসানে জড়িয়ে প্যাশন প্যারেডে চোখের জলে গাল ভিজিয়ে মানুষের আবেগে কাতুকুতু দেয় ঃ বাংলাকে ভাঙতে দেব না ! কী কইবো বাপ, সবই বত্রিশ বছরের পাপ----হিটলার-হোনেকর-পলপটদের এই পাপের তাই পরিবর্তন চাই'।......

যাদের কাছে খবর এখন কমোডিটি, ঘণ্টা-মিডিয়ার খবর যেখানে তাজা খিস্তির চেয়েও ভয়ঙ্কর, সত্যের শবের ওপর পা রেখে নির্বোধের মতো বিজ্ঞোচিত ভাবে তারাই এখন চেল্লায়, "এটা তো লোকসভার ভোট, রাজ্যস্তরে আবার কিসের পরিবর্তন ?"---আরে, এরাজ্যে পরিবর্তন চাই সেই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশটি মিনারের, যেগুলি মানুষকে দেবতা বানাবার ঘোষণা করে দেবতাকেই করেছে হাস্যাস্পদ। পরিবর্তন চাই সেই সব গজদন্ত মিনারগুলির, যেগুলি বত্রিশটি বছর ধরে চাঁদের আলো আর ভিখিরি থেকে কোটিপতি হওয়ার মন্ত্র লুট করে নিয়ে তিনবারের পোড়া বিড়ি থেকে নামী কোম্পানীর দামী সিগারেট ধরেছে (বিমান বসুর কাছে ঋণী)। পরিবর্তন চাই সেই পঁয়ত্রিশটি অনড় মিনারের যেগুলির শীর্ষদেশ থেকে কেবলই আওয়াজ ওঠে স্বজাতি, স্বধর্ম এবং স্বদেশ-সংস্কৃতির প্রতি উপেক্ষার ও অশ্রদ্ধার।

এবারে তাই কার বীজতলায় কোন উন্নয়নের বীজ কেমন বিকায় তা কেবল টাটাবাবারা নয়, মানুষও তার ঠিকানা চেয়েছিল, কিন্তু সে ঠিকানার সন্ধান মানুষ জানার অধিকার পাবে কি ? বারেবারে ডাকাতি করে নেওয়া এই রাজ্যের লোকসভা প্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বমহিমায় পুনশ্চ রাজ্যের মানুষের কাছেই প্রত্যাগমন করতে চেয়েছিল----কিন্তু ফিরতে পারবে কি ? স্বাধীন সত্ত্বায় ভোটের বাক্সে বোতাম টেপার স্বপ্ন নিয়ে মানুষেরা ভেসে উঠতে চাইছিল---কিন্তু ভাসতে পারবে কি ? প্রতিবাদের গান ভুলে যাওয়া শিল্পী বুদ্ধি জীবীরা এবারে তাই জীবনের সঙ্গীত সাধনায় পুনর্বার সা রে গা মা-য় প্রতিযোগিতায় আসতে চাইছিলেন---কিন্তু, তাদের সাধনাসিদ্ধ হতে পারবে কি ? মনে হয়, প্রথম দফার ভোটে এরাজ্যে অধরাই থেকে গেল ফাটল ধরা, শ্যাওলা পড়া সেইসব মিনারের পরিবর্তন। সমগ্র কেশপুর, গড়বেতা, মেদিনীপুরের ব্যাপক অংশে-চট তোলা খোলা বাক্সে মানুষের স্বাধীন ভোটাকাঙ্ক্ষার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছে জানালায় দাঁড়ানো তোজো-মুসোলিনির রক্তচক্ষু জল্লাদ নাটা মল্লিকেরা। পাহাড়ে স্ট্যালিনের গ্রে-হাউন্ডেরা নখর গুটাতে বাধ্য হলেও সমতলে নেমে ব্যাঘ্র হয়েছে তারা। কোচবিহারে ঘাটালে বিষ্ণুপুরে খণ্ডঘোষে বৈদ্যুতিক বাক্সের সাইলেন্ট ফ্রডে (নিঃশব্দ তঞ্চ কতায়) বারে বারে ভোটের বোতামের লাল-পিরিতির ছবি নগ্ন হয়ে কেস্তে হাতুড়ির বুকে সেঁটে গেছে। শোভন ভদ্র কথার আপাত নিরীহ, লাল রাইটার্সের পোষ্য এক আই. এ. এস-আমলা সুচতুরালির সাথে আলিমুদ্দিনকেই করেছে সেলাম---তুলতুলে গালের লাল গোলাপ, সেলাম, প্রভুপাদ আলিমুদ্দিনের পদলেহনের পুরস্কারে তোমাকে জানাই লাল সেলাম !... তাই, যদিও ছিল 'ওয়াটার, ওয়াটার, অ্যান্ড ওয়াটার এভরিহয়্যার'-----কিন্তু এজিদবাহিনীর মতো রাজশক্তির পেশীশক্তি, ক্রুর ষড়যন্ত্র এবং বেলাজ ঘাতকতায় হোসেন-হাসানেরা রাম-রহিমেরা বহুক্ষেত্রেই নাগালে পায়নি 'এ ড্রপ্ টু ড্রিংক'। রাজ্য জুড়েই ছিল পরিবর্তনকামী ঝড়। সেই ঝড়ের বাতাস ছিন্নভিন্ন করতে পারেনি রাজার রাজ্যজুড়ে পাতা চক্রান্তের অন্তর্ঘাতী জাল। নানা 'কমিশনে' কেনা আমলা-প্রশাসন এবং নানান 'কনসেশনে' পোষ্য কিম্বা প্রতারিত কমিশন কর্নিফুল লাল গোলামীর বকলেস বেহেস্তে----নমস্তে...নমস্তে।.....

রাজনীতির পাদুকা-পুরাণ

অর্ণব নাগ ঃ বঙ্গের এক বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীলদর্পণ'। কালটা বলা বাহুল্য স্বাধীনতার বেশ আগে। দর্শকাসনে রয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মঞ্চে তখন অভিনীত হচ্ছে নীল চাষে গররাজি এক চাষীর ওপর নীলকর সাহেবের নৃশংস অত্যাচারের দৃশ্য। সেই দেখে রাগে উত্তেজনায় গলগল করে ঘামছিলেন বিদ্যাসাগর। শেষমেষ আর থাকতে না পেরে বেমক্কা তাঁর পায়ের নাগরা চটি জোড়া ছুঁড়ে দেন অভিনেতার দিকে। নিজের অভিনয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি হিসেবে সেই অসাধারণ অভিনয়ের মালিক অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন ওই জুতো জোড়া। এরপর 'ফরটি টু' নাটকে অভিনয় করার সময়েও অনুরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল অভিনেতা বিকাশ রায়কে। একটি বাচ্চা ছেলেকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে আগুনে নিক্ষেপ করার এক দৃশ্যে একজন ক্ষিপ্ত দর্শকের জুতো হজম করতে হয়েছিল তাঁকে। জানা যায় কাজের আজীবন স্বীকৃতি হিসেবে সারাজীবন সেই স্মৃতি রক্ষা করেছিলেন বাংলার সাদা কালো চলচ্চিত্রের ওই তাবড় অভিনেতা।

এখন যুগ পালটেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার হাত ধরে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। অত্যাচারী শাসকের অত্যাচারের ভাষা পালটেছে। বদলে গেছে প্রতিবাদের ভাষাও। তবে ছোঁড়াছুঁড়িতে আমাদের প্রতিভা নেহাত মন্দ নয় ! যখন নাটক দেখতে লোক যেত, তা বিশেষ পছন্দ না হলে তখন পচা ডিম, টমেটো, আলু ছোঁড়া হোত বিস্তর। খেলার মাঠে (ফুটবল ও ক্রিকেট উভয়েই) জলের বোতল ছোঁড়ায় তো আমাদের বিশেষ হাতযশই রয়েছে! এই ছোঁড়াছুড়ির সংস্কৃতিতে নয়া আমদানী রাজনীতিকদের লক্ষ্য করে জুতো ছোঁড়া। তাই নিয়েই আমাদের নিবেদন পাদুকা-পুরাণ।

তবে এখন তো বিশ্বায়নের যুগ। তাই এই নয়া ক্রীড়াটি আত্মসাৎ করতে আমাদের বিশেষ সময় লাগেনি। যাই হোক, এই (অপ) সংস্কৃতির পুরাণটি এবারে সবিস্তারে দেখে নেওয়া যাক।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমকে লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়ছেন সাংবাদিক জার্নাল সিং।

পাদুকা-পুরাণ বর্ণনা করার আগে অবশ্যই জুতো আবিষ্কারের ব্যাপারটা দেখে নেওয়া দরকার। বিশ্বে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ডায়াসের সামনে তাঁর ভাষণ আওড়াচ্ছিলেন। অকস্মাৎ ইরাকি সাংবাদিক মুন্তাজির আল জাইদির হাত ধরে (নাকি পা ধরে?) তাঁর দিকে ধেয়ে 'জুতো' নামক উড়ন্ত মিশাইল। সেই বাউন্সারে অসাধারণ ডডত্বন্তন্স করলেন কিন্তু তিনি। ফলে জুতো তাঁর গায়ে লাগল না! গ্রিফিথের বলে ঠিকঠাক ডডত্বন্তন্স করতে না পারার জন্য মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল ভারতীয় দলের ওপেনার নরি কন্ট্রাকটরের। বুশ নরির কোচ হলে বোধহয় সে যাত্রায় মাথাটা বেঁচে যেত কন্ট্রাকটরের! যাই হোক, ওই জুতো ছোঁড়ার অপরাধে তিন বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে জাইদিকে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও। কেমব্রিজে তাঁর উদ্দেশ্যে উড়ে আসে এই ক্ষেপণাস্ত্র, থুড়ি,জুতো।

ভারতে এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গেল গত ৭ এপ্রিল। প্রসঙ্গত, তার অব্যবহিত আগেই '৮৪-এর শিখবিরোধী দাঙ্গায় প্রধান অভিযুক্ত জগদীশ টাইটলারকে ক্লিনচিট দেবার জন্য সিবিআই সুপারিশ করে সুপ্রিম কোর্টে। সেই প্রসঙ্গে দিল্লীতে ওইদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরমের কাছ থেকে কৈফিয়ত চেয়ে বসেন দৈনিক জাগরণের দিল্লীর সাংবাদিক জার্নেল সিং। চিদম্বরম উত্তর দিতে অস্বীকৃত হলে আলগোছে সে দিকে জুতো ছুঁড়ে দেন জার্নেল। ছি ছি করে ঢেউ ওঠে চারিদিকে। জুতো ছোঁড়া যে গর্হিত কর্ম সে ব্যাপারে সকলে একমত হলেও অবিচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রশ্নে টানাদোটানায় পড়ে যায় সমাজ। বিশেষ করে শিখ ভোটব্যাঙ্কের কথা ভেবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় জগদীশ টাইটলার ও আরেক অভিযুক্ত সজ্জন কুমারের।

এ অবধি তবু ঠিক ছিল। জুতো ছোঁড়াটা ক্ষোভের পরিচায়ক বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছিল। বিশেষ করে দেশের রাজনীতিতে এ ধরনের ঘটনা একেবারেই ছিল অভূতপূর্ব। কিন্তু এরপর যা শুরু হল তা এককথায় ন্যক্কারজনক কাহিনী। সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে গত ১০ এপ্রিল কুরুক্ষেত্রের কর্মীসভায় নবীন জিন্দালকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় জুতো। স্থানীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে গত ১৬ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশে কাটনির জনসভায় লালকৃষ্ণ আদবানীর দিকে জুতো ছোঁড়েন এক ব্যক্তি। এরপর ২১ এপ্রিল ধূলেতে প্রচারে গিয়ে জুতোর নিশানায় পড়েন জিতেন্দ্র। গত ২৬ এপ্রিল আমেদাবাদের সভায় টেগোর হলের মাঠে নির্বাচনী জনসভায় সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে, গান্ধীনগরের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র হিতেশ চগন জুতো ছুঁড়ে নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে। এর পরে জুতোক্রান্ত হয়ে 'জুতো সংস্কৃতিতে' নাম তুলে ফেলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরিয়াপ্পাও।

ভোটের এই মাগ্গিগণ্ডার বাজারে নেতারা হলেন গিয়ে একেকজন কল্পতরু। অকাতরে প্রেম-মানে ক্ষমা বিলোচ্ছেন তাঁরা। ভারতে যাঁরা-যাঁরা জুতো ছুঁড়েছেন এখনও পর্যন্ত তাদের কঠোরতম তো দূরের কথা ন্যূনতম কোনও শাস্তিই হয়নি। সুতরাং জুতো (অপ) সংস্কৃতি রমরমিয়ে চলছে। তাঁরা (নেতারা) কাদা ছোঁড়াছুড়ি করলেও তাঁদের (নেতাদের) ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আর ন্যায্য অপরাধে (জুতো ছোঁড়া অপরাধ তো নিশ্চয়ই) করলেও তাঁদের কৃপায় পার পেয়ে গিয়ে সেই নেতাদের ইমেজ উজ্জ্বল হয়। সমাজের পক্ষে এই বার্তা আর যাই হোক, কোনও শুভ ইঙ্গিত বহন করে আনবে না। ভোট বিমুখ দুর্জনেরা অবশ্য অন্য কথা বলছেন। তাঁদের বক্তব্য, কোনও কাজ না করে দুর্নীতিগ্রস্ত চোখের চামড়া এতই মোটা হয়ে গেছে যে ভোট বাজারে এই জুতো তাদের কাছে অনেকটা দৈব আশীর্বাদের মতই উড়ে আসছে যার দরুণ তাঁরা নির্বাচনী পরলোকে কিছুটা হলেও পাপস্খালনের সুযোগ পাচ্ছেন। টাইটলার, সজ্জনকুমারের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার কি তারই ইঙ্গিত নাকি? কে জানে বাবা? হবে হয়তো!

Swastika
18 May - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

লোহিত উপত্যকায় নতুন আশার গান

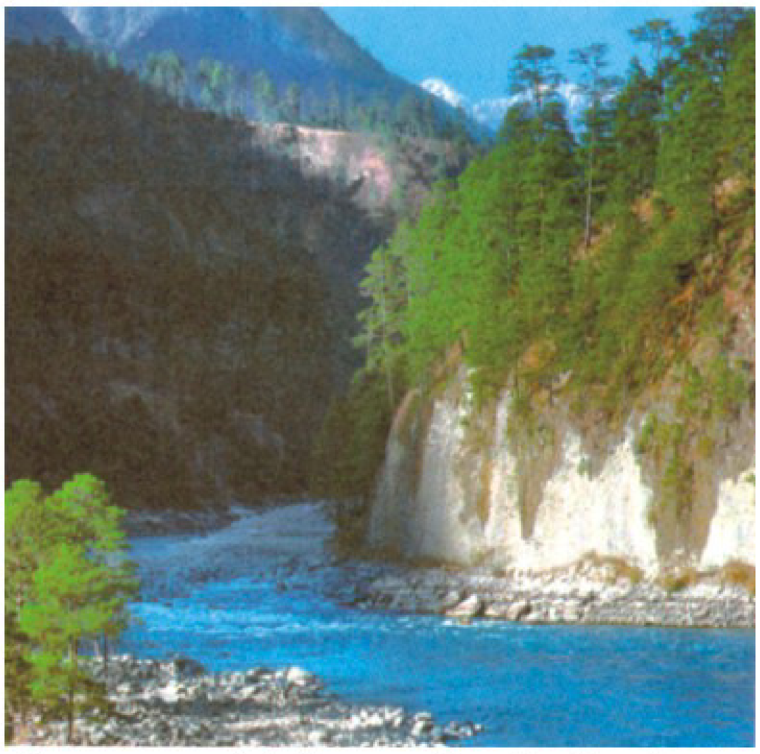

অর্ণব নাগ।। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই অবিস্মরণীয় লাইনটি যেন গন্ধবিধুর সমীরণে মূর্ত হয়ে উঠেছে অরুণাচল প্রদেশের পূর্বাংশে। প্রাক্‌-বসন্তের শিহরণে উন্নয়ণের দিশায় বাকি সব কটি ঋতুও এখানে আজি এ বসন্তে উপনীত হয়েছে। কয়েক বছর আগেও অরুণাচল প্রদেশের পূর্বাংশে এই লোহিত জেলা ছিল ভারতবর্ষের একটি অন্যতম দরিদ্র ও জনবিহীন এলাকা। বকুল গন্ধে বন্যার আগমনে লোহিত নদী এই জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল প্রায় অর্ধ-বৎসর। কিন্তু এখন মম অন্তর উদাসে নতুন আশার গানে গুঞ্জরিত হচ্ছে লোহিত জেলা।

লোহিত উপত্যকায় ফাগুন শুরু হয়েছিল প্রায় ৩ বছর পূর্বে। যখন পরশুরাম কুণ্ডে নদীর ওপর সেতু তৈরির প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল। যেখানে ঝড়ের মেঘের মতো ধেয়ে লোহিত নদী উপনীত হয়েছে একটি গিরিখাতে এবং ছড়িয়ে পড়েছে ২০ কি.মি. প্রশস্ত স্থানে। এবং গঠন করেছে একটি বক্র, কুণ্ঠিত জলপথ।

আসলে অরুণাচল প্রদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত এই লোহিত জেলার উন্নয়ণ খুবই দ্রুততার সঙ্গে ঘটেছে। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই জেলার ভৌগোলিক অবস্থান এখানকার অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণে বড় ভরসা। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ভারত সরকারের দূরদৃষ্টি, সর্বোপরি বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে সতর্ক পদক্ষেপ নেওয়া ও কড়া হওয়া দরকার।

উন্নয়ণের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ঃ

লোহিত নদীর পূর্বে চৌখাস এবং নামসাই এলাকা দু'টি বর্তমানে শিল্পতালুকের অংশ এবং তেজু, যেটি বর্তমানে লোহিত জেলার সদর দপ্তর, এখন বেশ উন্নত শহর। কয়েক বছর আগেও সেখানে মাত্র ৩২টির মতো দোকান ছিল, এখন যার সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়েছে। সেই সঙ্গে বহু দোকানে বিক্রি হচ্ছে দামী বিলাস-বহুল জিনিসপত্র। ওখানে ১ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ৫০০০ জনের হাতেই আছে সেলফোন। উন্নয়ণের কাজ সেখানে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, তার সুবিধার জন্য জেলাটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নতুন জেলার নামকরণ করা হয়েছে আনজু। হাওয়াই-এ করা হয়েছে

এর সদর দপ্তর। এটি তেজুর থেকে মধ্যবর্তী, সমতলভূমিতে অবস্থিত।

এখানকার অধিকাংশ গৃহকে আবার নতুন করে পাকাপোক্ত করা হয়েছে শক্ত টিনের চাল দিয়ে আচ্ছাদিত করে। স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন, সেইসঙ্গে আছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাও। হসপিটাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেও উপযুক্ত ডাক্তার রয়েছেন, রয়েছে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থারও। যেখানে আগে রিকশা পাওয়াই দুষ্কর ছিল, সেখানে এখন রাস্তাগুলি সবসময় বাস, ট্যাক্সি, ট্রাক, মোটর সাইকেলে ব্যস্ত। ভাবতে অবাক লাগলেও সত্যি সেখানে এখন পেশাদার কোচিং ইনস্টিটিউটের ছড়াছড়ি, রয়েছে ব্যাঙ্কের ATM সুবিধা, সাইবার কাফে ও বহু রেস্তোঁরা।

শুধুমাত্র চাষ-আবাদই আর একমাত্র জীবিকা নয় সেখানে, তার জায়গাটা এখন দখল করে নিয়েছে কমলালেবু ও আপেলের বাগিচা এবং এলাচের চাষ। ইলেকট্রিসিটি পৌঁছে গিয়েছে ঘরে ঘরে। দিরাক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে শুরু করলে যার একটি প্রবেশ পথ অসমের দিকে এবং ওয়ালং-এর পেছনে, তিব্বতের সীমারেখার ২৮০ কি.মি. অবধি প্রতিটি প্রত্যন্ত প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে বিদ্যুৎ। এই দীর্ঘ রাস্তাটি উন্নত হওয়ার পেছনে রয়েছে একাধিক নির্মিত কংক্রিটের সেতু। এবং বর্তমানে উন্নয়ণের সার্বিক হাওয়ায় সেখানে নদীর ওপর গড়ে উঠছে বহু হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার প্রজেক্ট।

পর্যটন কেন্দ্র ঃ

'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'-তে একটি বিখ্যাত লাইন ছিল। 'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ।' নদীর উত্তর ছিল 'মহাদেবের জটা হইতে।' বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সার্ধশতবর্ষে তাঁর প্রতি যেন আনুগত্য নিদর্শনের এক চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে টিডিং নদী। মহাদেবের জটার মতোই যার উৎপত্তি ৪০০০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি তুঙ্গশীর্ষ থেকে। যার শোভাবর্ধন করেছে ৭০০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট দুটি শৃঙ্গ। এই নদীটি উপতক্যায় লোহিত নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বৃহদ্‌ বনভূমির অবশিষ্টাংশ এখনও যে কারুর সমীহ আদায় করতে সক্ষম, মন কেমন করা এক অদ্ভুত অনুভূতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এরা। চৌখামের আপেল ও কমলালেবুর ফলবাগিচা এবং সেই সাথে Veneer মিল (আসবাবপত্রের জন্য কম দামের কাঠের ওপর সিরিস দিয়ে আঁটা উৎকৃষ্ট এক ধরনের কাঠের তৈরি শিল্প) পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। লোহিত থেকে হাউস যেতে গেলে যে সেতুটি দিয়ে পারাপার করতে হবে। তার ওপর থেকে আন্দোলিত দৃশ্যপট হয়তো আঁকেবাঁকে ছোট নদীর বৈশাখ মাসের হাঁটুজল নিয়ে প্রবহমানতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। সারতি নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ট্রপিক্যাল জঙ্গল যা আল্পসের মতই সমুচ্চ, মহান। আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে এই অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী।

সম্প্রতি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পর্যটন সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ওয়ালং থেকে ৫ কি.মি. দূরে ডং-এ গড়ে উঠছে সার্কিট হাউস, রেস্ট হাউস সমেত বিরাট ট্যুরিজম কমপ্লেক্স। দেশি-বিদেশি পর্যটককে স্বাগত জানাতে তাঁরা তৈরি। এর ফলে স্থানীয় যুবকদের কাছে খুলে গিয়েছে কর্মসংস্থানের এক অন্য দিগন্ত।

খনিজ সম্পদ ঃ

বৃহদ্‌ পরিমাণ চুণাপাথরের সন্ধান মিলেছে টিডিং-এ। দ্রুত বেড়ে ওঠা মহকুমা শহর হাউলিয়াং-এর কাছেই দোলাই-এ মার্বেল সংরক্ষণ রয়েছে। এবং একদা প্রহেলিকা ডাউ উপত্যকাও আর আজ অতটা রহস্যময়ী নয় এবং একইসাথে ওয়ালং-এর কথাও বলতে হয়। এ জেলায় আরও উল্লেখযোগ্য দুটি খনিজ হল গ্রাফাইট ও মলিরেডাইট। উচ্চ অসমের সন্নিহিত এলাকায় নিম্ন-ছাই কয়লার বিপুল সংরক্ষণ রয়েছে। রাস্তা তৈরির জন্য এধরনের কয়লা থেকে পিচ নিষ্কাশন খুবই সহজ এবং এর বাজার তৈরিই রয়েছে অরুণাচলের দ্বারপ্রান্তে তিব্বত ও ইউনানে। শেষ পাঁচ বছরে ভারতের সঙ্গে ইউনানের বাণিজ্য প্রায় ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা ৫০.৪৮ মিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৩ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। কার্সিং ও কলকাতার মধ্যে চালু হওয়া নবতম সংযোগের মাধ্যমে এ ধরনের বাণিজ্য হয় মূলত দীর্ঘ সমুদ্র পথে, বাকিটা আকাশে। কিন্তু উন্নয়ণের দৌলতে যদি অরুণাচল প্রদেশ ও ইউনানের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয় তবে আপার অসম ও পূর্ব অরুণাচল প্রদেশ দুই-ই উপকৃত হবে।

লোহিত ভ্যালি এবং পাহাড় তৈরি হয়েছে প্রো-ক্যাম্বিয়াম রক দিয়ে যেগুলি মূল্যবান পাথরে সমৃদ্ধ এবং পূর্বে প্রতিবেশি মায়ানমারের মোগক রেঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। ওয়ালং-এর কাছে সন্ধান মিলেছে পাইরাইট ও ক্যালসিয়াম সিলিকেটের, যেটি বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য কিন্তু অগ্রাধিকার অবশ্যই তিব্বতকে

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য, কিন্তু এই মুহূর্তে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারে এই অভাবনীয় উন্নয়ণশীল এলাকাটি।

জাউই, লোহিত নদীর তিব্বতী নাম, ওয়ালং-এর নিকটবর্তী শহর এবং বর্ডার থেকে এর দূরত্ব ৪০ কি.মি. পূর্ব তিব্বতী শহর কোয়ামডো এখন ভারতীয় পণ্য ও পর্যটকদের কাছে আগের থেকে আরও সুগম। বাংডা থেকে জাউই হয়ে আসা কোয়ামজোর অর্ধেক পথ চলে গিয়েছে উত্তর-পূর্ব এবং পূর্বের চেংডু ও কানসিং-এর দিকে। এই কানসিং-এর দিকে যাওয়ার রাস্তাটা যদিও বেশি লম্বা কিন্তু ইচ্ছে থাকলে স্টিলওয়েল রোডের থেকে একে অর্থনৈতিকভাবে বহুগুণ উপযোগী করে তোলা যেতে পারে। বিস্তর খরচাপাতি করে এই স্টিলওয়েল রোডকে ভারত সরকার পুনর্যোজিত, চওড়া ও শক্তপোক্ত করে তুলেছে।

১৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন রাস্তা গড়ে উঠতে চলেছে নদীর বাম তীরে যার সূচনা হয়েছে বর্ডার থেকে ওখারোর ছোট ছোট পাহাড় পর্যন্ত। এটি চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্ভাবনাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে। এ সব সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য, চীন কখনই চাইবে না শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণে তাদের দরজা উন্মুক্ত করতে। কারণ অরুণাচল প্রদেশের একাংশকে তাদের বলে অনেকদিনই দাবী করছে তারা। অবাধ বাণিজ্যিক সুযোগ নিয়ে চিন যে অরুণাচলকে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে কুক্ষিগত করে ফেলতে পারে সে আশঙ্কা থেকেই যায়। সুতরাং যে কোনও বাণিজ্যের ওপরই কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া নজরদারি প্রয়োজন। সেইসাথে সমগ্র অরুণাচল প্রদেশ জুড়েই কঠোর নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা দফতরের উন্নতি সাধন করতে হবে।

আরও একটা বিষয়, যেটা করতে হবে তা হল চীনের হাত থেকে তিব্বতকে মুক্ত করার যাবতীয় প্রয়াস কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরে করা দরকার। এই কারণে যে অরুণাচলের প্রতিবেশিদের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তবে চীন অধিগৃহীত তিব্বত। এই তিব্বতীরা চীনাদের আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে। এরাও মুক্তি চায় চীনাদের হাত থেকে। এ ছাড়া অরুণাচলে পাহাড়ি পথে বসবাসকারী মেজু ও ডিগারু মিশমিস এবং সমতলে অবস্থান করা খাম্পটিস এবং সিংকফ। এরা বরারই আগ্রাসী ব্যবসায়ী। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত একজন তিব্বতী বাণিজ্য প্রতিনিধি তেজুতে এবং রিমাতে (বর্তমানে জাউই) যা ওয়ালং থেকে ৮০ কি.মি. দূরে অবস্থিত একজন ভারতীয় প্রতিনিধি থাকতেন।

সুতরাং তিব্বতের সাথে পুরনো বাণিজ্যিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে, কোনও ছুঁৎমার্গ না রেখে কিন্তু নিরাপত্তাজনিত সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে চীনের সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে গেলে লোহিত উপত্যকা অদূর ভবিষ্যতে ছুঁয়ে ফেলবে উন্নতির শিখর।

স্বস্তিকা
আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর-এর ১২৫ তম জন্মবর্ষপূর্ত্তি-তে প্রকাশিত হচ্ছে কয়েকটি তথ্যনিষ্ঠ মননশীল রচনা।
লিখছেন সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, অজিত বিশ্বাস প্রমুখ।
অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ তো থাকবেই।
নিয়মিত সংখ্যার আকারেই প্রকাশিত হচ্ছে
সত্বর কপি বুক করুন। দাম ৪ টাকা।
প্রকাশিত হচ্ছে ২৫শে মে, ২০০৯

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com